পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে
স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বিএআরআই

প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৩

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা: ১,৫০০ কপি

www.bari.gov.bd

আমের আধুনিক উৎপাদন ও বিপণন কলাকৌশল

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

আমের আধুনিক উৎপাদন ও বিপণন কলাকৌশল

রচনা ও গবেষণায়

ড. মো. শরফ উদ্দিন

ড. বাবুল চন্দ্র সরকার

আসমা আনোয়ারী

সম্পাদনায়

ড. ফেরদৌসী ইসলাম

ড. বাবুল চন্দ্র সরকার

মো. হাসান হাফিজুর রহমান

ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
জননী প্রিন্টার্স
১০৫ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: jprinters15@gmail.com

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

আম অত্যন্ত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে, যা প্রাকৃতিক ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম উৎস। বিগত কয়েক দশকে আমের বাণিজ্যিক উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে আম চাষ লাভজনক হওয়ায় নতুন নতুন অঞ্চলে আমের চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। পূর্বে আম চাষ রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিস্তৃত হলেও বর্তমানে নওঁগা, নাটোর, সাতক্ষীরা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ পর্যন্ত আমের ১৮টি উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিবছর ফলদানকারী পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে ৪টি হাইব্রিড ও ১টি বারমাসী জাত রয়েছে। বিএআরআই উদ্ভাবিত বারি আম-৪ (হাইব্রিড) নাবী জাতটি দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বারোমাসী বারি আম-১১ জাতটি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিএআরআই বিজ্ঞানীরা আমের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উত্তম কৃষি চর্চা যথাযথভাবে অনুসরণ

না করা, বিনা কারণে ঘন ঘন বালাইনাশক প্রয়োগ, আমে ও আম বাগানে সময়ে-অসময়ে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার এবং আমের সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাসমূহ সঠিকভাবে পালন না করা আম উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায়।

বিবিএস, ২০২২ অনুসারে দেশে ১১৬১২৩ হেক্টর জমি থেকে ১২.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর তথ্যানুযায়ী সারাদেশে আম উৎপাদন এলাকা ১ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর ও মোট উৎপাদন ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন (২০২০-২০২১)। প্রতি বছর সারাদেশে আম চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলের বিদ্যমান ঘাটতি মেটানো এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে উচ্চফলনশীল জাত, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশে ও আর্ন্তজাতিক বাজারে আমের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে বিএআরআই উদ্ভাবিত আমের জাত, স্থানীয় বাণিজ্যিক জাত ও জার্মপ্লাজম, বিদেশি জার্মপ্লাজম সচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং একই সাথে লাগসই আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে।

এ পুস্তিকাটি আম উৎপাদনকারী কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, নার্সারি মালিক এবং সাধারণ পাঠকদের অত্যন্ত উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি। পুস্তিকাটি রচনা ও সম্পাদনার সাথে জড়িত সকল বিজ্ঞানীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. দেবাশীষ সরকার

পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রাক্‌কথন

আম আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। স্বাদে, গন্ধে ও দেখতে খুবই আকর্ষণীয় বলে আমের সাথে অন্য কোন ফলের তুলনা হয় না। এজন্য আমকে ফলের রাজা বলা হয়। আম সবার নিকট সমানভাবে সমাদৃত। আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং খনিজ উপাদান থাকে যা আমাদের প্রাকৃতিক ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম উৎস।

বিবিএস ২০২২ অনুসারে দেশে ১১৬১২৩ হেক্টর জমি থেকে ১২.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর তথ্যানুযায়ী সারাদেশে আম উৎপাদন এলাকা ১ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর ও মোট উৎপাদন ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন (২০২০-২০২১)। প্রতি বছর সারাদেশে আম চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই ১৮টি আমের জাত উদ্ভাবন করেছে। কৃষক পর্যায়ে বারি আম-৩, বারি আম-৪, বারি আম-১১ এবং বারি আম-১২ জাতের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হওয়ায় বর্তমানে ধানের জমিতে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতি বছর আমের উৎপাদন বাড়লেও গুণগত মানসম্পন্ন ও রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন আশানুরুপভাবে বাড়ছে না।

বর্তমানে উৎপাদিত আমের প্রায় ৮৫ ভাগ সরাসরি খাওয়ার জন্য, ১৫ ভাগ আম প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য এবং অল্প পরিমাণে আম রপ্তানি হচ্ছে। এ সকল বিবেচনায় গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতসহ, স্থানীয়, বিদেশি জাত পরিচিতি, উৎপাদন প্রযুক্তি ও বারি উদ্ভাবিত অন্যান্য প্রযুক্তি, আমের রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, আম সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিশদভাবে ধারণা দেয়া হয়েছে।

পুস্তিকাটি আম উৎপাদনকারী কৃষক, আমবাগান মালিক, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, নার্সারি মালিক ও সাধারণ পাঠকদের উপকারে আসবে এবং গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পুস্তিকাটির রচনা ও সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. ফেরদৌসী ইসলাম

ভূমিকা

আম একটি দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক ফসল। বর্তমানে দেশের সকল এলাকয় আম জন্মাতে দেখা যায়। কোন কোন এলাকায় এটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ দেশে যে ৭৮ টি ফল চাষাবাদ হচ্ছে আম সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিবিএস (২০২০) অনুসারে এ দেশে ফল উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৫.১৪ লাখ হেক্টর এবং মোট উৎপাদন ৫০.৯২ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে ফলের চাষকৃত জমির শতকরা ৪০ ভাগ এ আম চাষাবাদ হয়। তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় আমের চাষাবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ দেশে ৯৫২৮৩ হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হচ্ছে যার উৎপাদন ১২.২২ লক্ষ টন (বিবিএস, ২০২১)। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে এ দেশে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আম চাষাবাদ হচ্ছে এবং এর উৎপাদন প্রায় ২৫.০ লক্ষ টন। বর্তমানে আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। দেশের সকল স্থানে আমের চাষাবাদ হচ্ছে, তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফলনের ব্যাপক তারতম্য দেখা যাচ্ছে। যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় আমের ফলন অন্য যে কোন এলাকার চেয়ে অনেক বেশি এবং গুণগতমান ভালো। গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটু যত্নবান হলে আমের ফলন কয়েকগুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, একজন মানুষের প্রতিদিন ফলের চাহিদা ২০০ গ্রাম কিন্তু প্রাপ্যতা মাত্র ৮২ গ্রাম। এমতাবস্থায়, দেশের মানুষের ফলের চাহিদা পূরণে আমের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। এ বইটিতে আমের উৎপত্তি হতে শুরু করে আমের খাদ্যমান ও ব্যবহার, আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমের অবদান, জাত ও জার্মপ্লাজম ও বাহারী নামকরণ, আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশল, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা, আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার, জাতভিত্তিক পরিপক্কতা, সংগ্রহ এবং আম গাছের পরিচর্যার মাস-পঞ্জী ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উৎপত্তি ও বিস্তার

আম (*Mangifera indica* L.) Anacardiaceae পরিবারভূক্ত একটি বহুবর্ষজীবি বৃক্ষ। আমের উৎপত্তিস্থান নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ থাকলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে এর উৎপত্তিস্থান হচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশ (আসাম), মায়ানমারের পশ্চিমাংশ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল (চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল)। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। বর্তমানে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ মন্ডলের ১০০টি দেশে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে ভারত এবং চীনের অবস্থান দ্বিতীয়। এছাড়াও আম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি।

আমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আম চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আম বাগানের মালিক প্রতি বছর আম বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। তাছাড়া বয়স্ক আমগাছ বিক্রি করেও অনেক অর্থ পাওয়া যায়। ফলবান আমবাগান স্থাবর সম্পত্তির মত, এ থেকে বছরের পর বছর আয় আসতে থাকে। আম চাষ দানাদার শস্য যেমন-ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি চাষাবাদের চাইতে কয়েকগুণ বেশি লাভজনক। ফলে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুন নতুন আম বাগান। সমতল ভূমি থেকে শুরু করে চরাঞ্চল, পাহাড়াঞ্চল এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ। আমের মৌসুমে আম উৎপাদনকারী এলাকাসমূহের ৮০-৮৫ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নতুন আমবাগান স্থাপন, আম বাগানে সার প্রয়োগ, স্প্রে করা, আম সংগ্রহ, পরিবহন, বাছাইকরণ, কার্টুন তৈরি, ঝুড়ি তৈরি, ট্রাক ভর্তি, খাবার সরবরাহ, আড়তদার, ফড়িয়া, বাগান ক্রেতা, কুরিয়ার ব্যবসা, রপ্তানি, বিভিন্ন কোম্পানির ঔষধ বিক্রয়, নিকট আত্মীয়দের কাছে আম পৌঁছান ইত্যাদি।

আমের খাদ্যমান ও ব্যবহার

আম পুষ্টিগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ফল। আমে মানুষের দেহের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। পাকা আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ (ক্যারোটিন-৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম) বিদ্যমান। কাঁচা আমে পাকা আমের চেয়ে দেড়গুণ ভিটামিন-সি রয়েছে। আমের ক্যালরিমান আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি এবং পীচফলের চেয়েও বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমে রয়েছে প্রোটিন ০.৫১ গ্রাম, চর্বি ০.২৭ গ্রাম, শর্করা ১৭.০ গ্রাম, আঁশ ১.৮০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০.০ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.১৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৯.০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১১.০ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ১৫৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ২৭.২০ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.৫৮ মিলিগ্রাম এবং থায়ামিন ০.০৫৬ মিলিগ্রাম। পছন্দের এই ফলটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। আম থেকে বিভিন্ন ধরনের আচার, চাটনি, আমসত্ত্ব, আমচুর, মোরব্বা, স্কোয়াস, চকলেট, ক্যান্ডি, ললিপপ, সিরাপ, ড্রাইড

ম্যাংগো স্লাইস ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও প্যাকেটজাত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ম্যাংগো বার, ম্যাংগো জুস, ম্যাংগো ড্রিংকস যেগুলো দেশে ও বিদেশে খুবই জনপ্রিয়। প্রাণ এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড, আব্দুল মোনেম লিমিটেড, কিষোয়াণ এগ্রো প্রোডাক্ট'স লিমিটেড, আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড আমের পাল্প তৈরি করে এবং সারাবছর ফ্রুট ড্রিংকস, আইসক্রিমসহ অন্যন্য আমজাত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করে । ঔষধ শিল্পে আম বেশ গুরুত্ব বহন করে। আমের পাতা, ফুল, ফল ও বীজ ইউনানী হারবাল, এ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত আম খেলে বিভিন্ন জটিল রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাকা আম ল্যাকজেটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁচা আম চক্ষুপ্রদাহ ও পাকা আম যকৃতকে কর্মক্ষম রাখতে কাজ করে থাকে। পোড়ানো আম পাতার ধোয়া হিক্কা রোগ ও গলার প্রদাহে ব্যবহার্য। কচি আম পাতার রসে দাঁতের ব্যথা দূর হয়। সম্প্রতি একটি গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, আমে বিদ্যমান ডায়েটরী ফাইবার ক্যানসার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে এবং রক্তে কলেস্টেরল এর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

জাত ও নামকরণ

আম *Mangifera* গণের অন্তর্ভুক্ত। এ গণের আরও ৬৯টি প্রজাতি রয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কত প্রজাতির আম রয়েছে তার সঠিক হিসাব নেই। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় এদেশে প্রায় ৮০০ ধরনের আম রয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ৪৩টি আমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সকল আমের নামকরণও হয়েছে আলাদাভাবে। বাগান মালিক নিজে নিজেই নিজ নামসহ স্ত্রী, পুত্র, কণ্যার নামে আমের নামকরণ করেছেন। আমের নামকরণ সত্যেই বিচিত্র রকমের। বিভিন্ন দেশে আমকে ডাকা হয় বিভিন্ন নামে যেমন আম, ম্যাংগো, আম্বা, মাংগুয়ো, মা মুয়াং ইত্যাদি। পৃথিবীর অনেক দেশ আবার পরিচিত নিজ দেশে উৎপাদিত আম রপ্তানি করে। যেমন ভারত-আলফনসো ও চৌষা, পাকিস্থান- সিন্ধরী, ফিলিপাইন- ক্যারাবাউ এবং থাইল্যান্ড- নমডকমাই জাতের আমের মাধ্যমে পরিচিতি পেয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ১৮টি আমের জাত মুক্তায়ন করেছে যার মধ্যে ৪টি হাইব্রিড রয়েছে। বাংলাদেশে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত এবং বেশ কিছু স্থানীয় জাত রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে মুক্তায়িত আমের জাতগুলো হলঃ বারি আম- ১, বারি আম- ২, বারি আম- ৩, বারি আম- ৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬, বারি

আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯ (কাঁচামিঠা), বারি আম-১০, বারি আম-১১ (বারোমাসি), বারি আম-১২, বারি আম-১৩ (হাইব্রিড), বারি আম-১৪ (রঙিন), বারি আম-১৫, বারি আম-১৬, বারি আম-১৭ (হাইব্রিড) এবং বারি আম-১৮ (হাইব্রিড)।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের বাউ জার্মপ্লাজম সেন্টার হতে মুক্তায়িত হয়েছে আমের ২৫টি জাত। এ জাতগুলো হলো- এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১ (শ্রাবণী), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২ (সিন্দরী), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৩ (ডায়াবেটিক), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৪ (রাড়ি), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৫ (শ্রাবণী-২), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৬ (পলিএমব্রায়োনি-১), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৭ (পলিএমব্রায়োনি-২), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৮ (পলিএমব্রায়োনি-রাঙ্গুয়াই-৩), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৯, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১০ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১১, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১২, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৩ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৪, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৯ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১০ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১১, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১২, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৩ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৪, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৫ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৬ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৭, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৮, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৯ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২০, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২১ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২২ এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২৩ (তাইওয়ান গ্রিন), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২৪ (তাইওয়ান রেড) এবং এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২৫। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নাম জানা ও অজানা স্থানীয় গুটি জাতের আম।

স্থানীয় জাতের আম

ল্যাংড়া, খিরসাপাত, গোপালভোগ, ফজলি, আশ্বিনা, বোম্বাই, অগ্নি, অমৃত ভোগ, আলফাজ বোম্বাই, আতাউল আতা, আরিয়াজল, আরাজনমা, আলম শাহী, গিলা, গোলাপবাস, আনারস, ইলশাপেটি, কলাচিনি, কাঁচামিঠা, কালিয়া, কৃষ্ণচূড়া, টিক্কাফারাশ, টিয়াকাঠি, কালাপাহাড়ী, কালিভোগ, কালুয়া, কাঞ্চন খোসাল, কাজলা সিন্দুরী, কিষাণভোগ, কোহিনুর, কোহিতুর, কুয়া পাহাড়ী, টোফা, কাজল ফজলী, কাইয়া ডিপি, কাটাসি, গোলাপখাস, গোলা, গুলি, গৌরজিত, গুলগুলি, চেপি, চরবসা, চম্পা, চন্দন খোস, চিনি কালাম, চিনি বড়ই, চিনি পাতা, ছাবিয়া, ছানাজুর, ছফেদা, জালী বান্ধা, ভাংগা, জিলাপীর ক্যাড়া, জোয়ালা, জিতুভোগ,

গোবিন্দভোগ, জর্দা, জর্দালু, ত্রিফলা, বাওয়ানী, বাউনি লতা, তাল পানি, দারভাংগা, দর্শন, দাদভোগ, দেউরী, দিলসাদ, দোফলা, দিলির লাড়ুয়া, দুধিয়া, দেওভোগ, দুধসর, বড়বাবু, নারিকেলী, নারকেল পাথী, নয়ন ভোগ, প্রসাদ ভোগ, জিতুভোগ, সীতাভোগ, বগলাগুটি, পাথুরিয়া, ফজলী কালান, ফনিয়া, বারমাসি, বোতল বেকি, বোতলা, বড় শাহী, বাতাসা, বাউই ঝুলি, বিড়া, বেগমপছন্দ, কমলপছন্দ, বেল খাস, বিমলা, বিশ্বনাথ, বোম্বাই কেতুলা, বদরুদ্দোজা, বোম্বাই গোপালভোগ, বোম্বাই খিরসা, বৌ ভূলানী, বৃন্দাবনী, সাহা পছন্দ, বাদশাভোগ, ভাদুরী, ভবানী, ভবানী চৌরাস, ভারতী, মাল ভোগ, মাংগুড়া পাকা, মিসরীদাগী, মিসরীভোগ, মিসরী দানা, মিসরীকান্ত, ভূত বোম্বাই, মতিচুর, মোহনভোগ, মোহন পছন্দ, রাজরানী, রাম প্রসাদ, রানী পছন্দ, কাজী পছন্দ, বিলুপছন্দ, রানী ভোগ, রাজ ভোগ, কালিভোগ, জিবাভোগ, লাক্ষৌ, লাদুয়া, লাড়ুয়া, লোরাল, লালমুন, লক্ষণভোগ, লতা খাট, লতা বোম্বাই, নাবী বোম্বাই, লোহাচুর, শ্যামলতা, রসবতী, সাটিয়ার ক্যাড়া, সাদাপাড়া, সবজা, সুবা পছন্দ, শাহী পছন্দ, সরিখাস, শরিফ খাস, সিন্দুরী, সারাবাবু, শোভা পছন্দ, সুলতান পছন্দ, সফদরপছন্দ, সূর্যপুরী, সুরমাই ফজলি, নাগ ফজলি, হায়াতী, হিমসাগর, খুদি খিরসাপাত, ক্ষীরপুরি, ক্ষীরমন, ক্ষীর টাটটি, খীর বোম্বাই, বেলতা, হাঁড়িভাঙ্গা, বৈশাখী, গৌড়মতি, হুক্কা, লাড়ুয়ালী, ডালভাঙ্গা, মন্ডা, মিছরী দমদম, নীলাম্বরী, খান বিলাস, বাতাসা, মনাহারা, পাথুরিয়া, তোহ্ফা, ফোনিয়া, কপিল বাংরি, মধুচুষকি, মধুমামি, নকলা, মোহিনিসিন্দুরী, ভুজাহাড়ি, সন্ধ্যাভারুতি, পদ্মমধু, লতারাজ, বৃন্দাবনি, যশোহরি, মাতৃভোগ ইত্যাদি।

উৎপাদন কলাকৌশল

আমের ভালো ফলন পাওয়ার জন্য চারা বা কলম লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। যেগুলো সময়মত ও সঠিক সময়ে করতে পারলে চাষীরা প্রতিবছর আশানুরূপ ফলন পাবেন। নিম্নে আম বাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

জলবায়ু

এ দেশের জলবায়ু আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। তারপরও উৎকৃষ্টমানের আম প্রধানত উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতে হয়ে থাকে। যেমন- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাটি ও আবহাওয়া আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। আমের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০

সেন্টিমিটার। যে সকল স্থানে সারা বছর আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করে সেখানে আম ভালো হয় না। আমের জন্য সবসময় শুষ্ক আবহাওয়া দরকার। পুষ্পায়ন ও ফল ধারণের সময় ঠাণ্ডা এবং ফলের বর্ধন ও পরিপক্কতার জন্য গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। ফুল-ফল ধারণের সময় বৃষ্টিপাত না হওয়া উত্তম। কারণ ঐ সময় বৃষ্টিপাত হলে ফুলের পরাগরেণু বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় ফলে পরাগায়ন ও ফলধারণ ব্যাহত হয়।

স্থান নির্বাচন

দীর্ঘস্থায়ী আমবাগানের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আম বাগানের সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু, জমির প্রকৃতি, মৃত্তিকার গুণাগুণ, পানির সহজপ্রাপ্যতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ফল বিপণনের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সামাজিক প্রভাবের উপর। কলা, পেঁপে, পেয়ারাসহ অন্যান্য স্বল্পস্থায়ী ফলের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে ভুল হলেও এর ক্ষতি স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু আম গাছ বহুবর্ষজীবি এবং বাগানের স্থায়ীত্ব প্রায় একশ বছরেরও বেশী। সুতরাং আম বাগানের স্থান নির্বাচনে ভুল হলে তা সংশোধন করা কষ্ঠসাধ্য কাজ। ইট ভাটা, অটো-রাইস মিল ও অন্যান্য কারখানা সমৃদ্ধ এলাকা যেগুলো থেকে গরম বাতাস বের হয় ফলে আশেপাশের এলাকা উত্তপ্ত থাকে সে সমস্ত জায়গায় আম বাগান করা উচিৎ নয়।

মাটি

আম গাছ যে কোন প্রকার মাটিতে জন্মে। তবে আম গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য মাটি গভীর হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত ২.০-৬.০ মিটার গভীরতাযুক্ত মাটি আম চাষের জন্য উপযোগী। আমের জন্য মাটির অম্লতা বা পিএইচ মান ৫.৫-৮.০ সর্বোত্তম।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দো-আঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। বর্ষায় পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করলে গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

রোপণ প্রণালী

রোপণ পণালী হলো বাগানে রোপিত চারার পারস্পারিক অবস্থান। প্রতি একক জমিতে কতটি চারা লাগানো সম্ভব তা নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব, জমির আকৃতি

এবং রোপণ পদ্ধতির উপর। বাগানে আম গাছ বর্গাকার, ত্রিভূজাকার, আয়তাকার ও ষড়ভূজাকার পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে।

চারা রোপণের সময়

চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হল বর্ষার শুরু বা শেষ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় বা ভাদ্র-আশ্বিন মাস। এ সময় কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়। যার কারণে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রস থাকে ফলে চারা লাগানোর সময় সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বছরের যে কোন সময় চারা/কলম লাগানো যেতে পারে।

রোপণ দূরত্ব

রোপণ দূরত্ব মূলত নির্ভর করে আমের জাত ও মাটির উর্বরতার উপর। দ্রুত বর্ধনশীল আমের জাত বা বড় আকৃতির গাছ হলে সাধারনত ১০ মিটার বা প্রায় ৩০ ফুট দূরত্বে লাগানো যেতে পারে। এ দূরত্ব অনুসরণ করলে এক বিঘা জমিতে ১৩-১৪ টি গাছ লাগানো সম্ভব। মধ্যম আকৃতির গাছ হলে ৮ মিটার বা ২৪ ফুট দূরত্বে লাগানো যেতে পারে এবং এ দূরত্ব অনুসরণ করলে এক বিঘা জমিতে ২১ টি গাছ লাগানো সম্ভব। খাটো আকৃতির জাত যেমন- বারি আম-৩ (আম্রপলি) হলে ৬-৮ মিটার দূরত্বে লাগানো যেতে পারে এবং এ দূরত্ব অনুসরণ করলে এক বিঘা জমিতে প্রায় ২০-২৭ টি গাছ লাগানো যায়। অর্থাৎ জাতভেদে আমগাছের রোপণ দূরত্ব ৬ × ৬ মিটার এবং ১০ × ১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জাত নির্বাচন

জাত নির্বাচনের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন জাতের আমের চাহিদা বেশী, গুণগতমান ভালো এবং বাজারমূল্য বেশী তার উপর ভিত্তি করে জাত নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দেশে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট আমের জাত (ল্যাংড়া, খিরসাপাত, হিমসাগর, ফজলি, গোপালভোগ ও বোম্বাই) রয়েছে। যেগুলো রঙিন না হলেও স্থানীয় বাজারে চাহিদা বেশি বলে এ জাতসমূহের চাষাবাদ বেশ লাভজনক।

চারা নির্বাচন

বাগান স্থাপনের জন্য চারা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুস্থ-সবল ও রোগ-পোকার আক্রমণ মুক্ত চারা রোপণ করলে উত্তম ও কাঙ্খিত ফলন পাওয়া

সম্ভব। রোপণের জন্য ৩-৪ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ২-৩ টি ডাল বিশিষ্ট চারা নির্বাচন করা প্রয়োজন। ১-২ বছর বয়সী ফাটল/ভিনিয়ার কলমের চারা বাগানে লাগানোর জন্য উত্তম।

গর্ত তৈরি

চিত্র: চারা বা কলম রক্ষার কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি

বর্গাকার, আয়তাকার, ত্রিভূজাকার বা ষড়ভূজাকার যে কোন প্রণালীতে চারা রোপণ করা হোক না কেন, গাছ লাগানোর স্থানটি চিহ্নিত করে বর্ষা শুরুর আগেই সেখানে গর্ত তৈরি করতে হবে। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে ১ মিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক অংশের মাটি এক পার্শ্বে এবং নিচের অংশের মাটি অন্য পার্শ্বে রাখতে হবে। অত:পর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ১০ গ্রাম বোরিক এসিড উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি ওলট-পালট করে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় উপরের অর্ধেক অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না হলে প্রয়োজনে পার্শ্ব থেকে উপরের মাটি গর্তে দিতে হবে। তবে গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট পরিহার করা উত্তম।

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাটি ভালোভাবে মিশিয়ে মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে চারদিকে মাটি দিয়ে গাছের চারপাশের মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের সময় চারাটি যেন ভেঙ্গে না যায় এবং চারা বা কলমের গোড়াটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির নিচে ঢুকিয়ে না দেয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। কলমের চারা রোপণের পর চারিদিকে বেড়া দিতে হবে। অত:পর বৃষ্টি না হলে কয়েকদিন সেচ দিতে হবে।

চারা ও ফলবান গাছের পরিচর্যা

সেচ প্রয়োগঃ কলমের চারা লাগানোর পর প্রথম কয়েক বছর যাতে গাছের বৃদ্ধি বেশি হয় সেজন্য খরা মৌসুমে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত ১৫ দিনের ব্যবধানে সেচ দিতে হবে। তবে ফলবান গাছের ক্ষেত্রে সেচ প্রয়োগে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন গাছে মুকুল আসার ২-৩ মাস পূর্বে সেচ দেওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ

আম গাছের সুষম বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনের জন্য প্রতি বছর সার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। গাছের বয়স, আকৃতি এবং মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে আম গাছের সারের মাত্রা নিরূপণ করতে হয়।

গাছে সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০-এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	২৬	৩৫	৪৪	৫২	৭০	৮৭
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৮	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৮	৪৩৮	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০
এমওপি (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৬১২	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৮	১৮	২৬	২৬	৩৫	৪৫
বোরিক এসিড (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৫০	৫০	৭০	৮৭

প্রয়োগ পদ্ধতি

বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বোরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ জাতভেদে ফল যখন ফল মটর দানার মত হয়

তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার ফল সংগ্রহের কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মি. দূরে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এই দূরত্ব বাড়তে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

চিত্র: সার প্রয়োগের নালা পদ্ধতি

সেচ প্রয়োগ

সেচের সংখ্যা ও পরিমাণ সাধারণত কোন স্থানের মাটি, জলবায়ু প্রধানত বৃষ্টিপাত এবং তার বিতরণ এবং গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে। আম চাষে সাধারণত শুষ্ক মৌসুম যেমন নভেম্বর-এপ্রিল মাসে বেশি এবং বর্ষাকালে (মে-জুন) কম সেচের প্রয়োজন পড়ে। এঁটেল ও ভারী মাটিতে বেলে মাটির তুলনায় সাধারণত কম সেচ দিতে হয়। এ সব বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করে, ৬ মাস বয়সের গাছে ২-৬ দিন পর পর, ৬-১৮ মাস বয়সের গাছে ৪-১২ দিন পরপর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। তবে ফলন্ত গাছে সম্পূর্ণ ফুল ফোটার পর্যায় থেকে ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করলে উচ্চ ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন ফল পাওয়া সম্ভব। পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে প্রত্যেক গাছের চারদিকে ডাইক বানিয়ে সেচ দিতে হবে। এতে করে পানির অপচয় হ্রাস পাবে। আম বাগানে প্লাবন পদ্ধতিতেও সেচ দেওয়া যায়। তবে, ভালো ফলন পাওয়ার জন্য গাছে মুকুল বের হওয়ার অন্তত ২-৩ মাস আগে সেচ

চিত্র: সেচ প্রদানের পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতি

দেওয়া অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এই সময়ে সেচ দিলে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি হয় কিন্তু ফুল কম আসে।

আগাছা দমন

আগাছা আম গাছের খাদ্যে ভাগ বসায়। আম গাছের গোড়ায় এবং আমবাগানে যাতে আগাছা না জন্মায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আগাছা দমন করতে বাগানে লাঙ্গল বা টিলারের সহায্যে মাঝে মাঝে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম বার বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে এবং দ্বিতীয় বার বর্ষা শেষ হয়ে আসার পর পরই জমিতে চাষ দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।

পরগাছা দমন

আমাদের দেশে আমগাছে দুই ধরনের পরগাছা উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে পরগাছা উদ্ভিদ ধ্যারা নামে পরিচিত। ছোট গাছের চেয়ে বড় বা বয়স্ক আমগাছে পরগাছার আক্রমণ বেশী হয়ে থাকে। পরগাছা উদ্ভিদের বীজ আম গাছের ডালে অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকে। পরগাছা আমগাছের শাখা-প্রশাখা থেকে প্রয়োজনীয় পানি, খাদ্যরস, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি শোষণ করে বেঁচে থাকে। পরগাছার শেকড় থাকে না, তারা শেকড়ের মত এক প্রকার হষ্টোরিয়া তৈরি করে। হষ্টোরিয়া গাছের ডালে প্রবেশ করে ডাল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। আক্রান্ত ডালের প্রায় সব খাবার পরগাছা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত শাখা-প্রশাখা দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশী হলে আম ডালের অস্তিত্ব থাকে না বরং পরগাছা প্রভাব বিস্তার করে বাড়তে থাকে। লরানথাস জাতীয় পরগাছার পাতা দেখতে কিছুটা আম পাতার মতই। তাই ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে দূর থেকে পরগাছার উপস্থিতি বোঝা যায় না তবে পরগাছায় ফুল ও ফল ধারণ করলে দূর থেকে পরগাছার উপস্থিতি বোঝা যায়। এ সময়ে পরগাছা ফুল ফুটন্ত অবস্থায় থাকে ফলে সহজেই সনাক্ত করা যায়। পরগাছা আকর্ষণীয় ফুল ও ফল উৎপন্ন করে। বীজসহ ফল পাখিতে খায় কিন্তু বীজ হজম না হওয়ায় তা মলের সাথে বের হয়ে

চিত্র: আম গাছে পরগাছার আক্রমণ

আসে। এ বীজ আম গাছের ডালে পতিত হয়ে অঙ্কুরিত হয় ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ষাকালে পরগাছার বীজ বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত ডাল পরগাছার গোড়াসহ কেটে ফেলতে হবে। কাটাস্থানে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দোপেষ্টের প্রলেপ দিতে হবে। পরগাছায় ফুল ও ফল আসার আগেই সেটি ছাঁটাই করা উচিত।

গাছের কাঙ্খিত কাঠামো প্রদান (Training)

চিত্র: সুন্দর কাঠামোযুক্ত গাছ

একটি বাগানের গাছগুলো দেখতে কেমন হবে, সেই বিষয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে। চারা বা কলম নির্বাচন থেকেই এই কাজটি শুরু করতে হবে। গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য রোপণের ২-৩ বছর পর্যন্ত গোড়ার দিকে ১-১.৫ মি. কাণ্ড রেখে ডাল ছাঁটাই করতে হবে। চারা গাছের গোড়ার কাঠামো ঠিক ও সোজা রাখার জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় ডাল ছাঁটাই করা উচিত। এছাড়াও ফলবান গাছের কাঠামো ঠিক রাখার জন্য নিয়মিতভাবে ট্রেনিং সম্পন্ন করতে হবে। ডালের কাটা অংশে বোর্দোপেষ্ট (১০০ গ্রাম তুঁত, ১০০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানি) এর প্রলেপ দিতে হবে অন্যথায় ক্ষতস্থান দিয়ে নানা ধরনের রোগের আক্রমণ হতে পারে। এই পেষ্ট তুলির মাধ্যমে ডালের কাটা অংশে প্রয়োগ করা যায়। ফল সংগ্রহ করার পর পরই ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে এবং এরপর গাছের বয়স অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ (Prunning)

চারা ও ফলবান উভয় গাছে ডালপালা ছাঁটাইকরণের প্রয়োজন হয়। নতুন বাগান স্থাপনের সময় ডালপালা ছাঁটাইকরণ করা দরকার। রোগাক্রান্ত বা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত ডালপালা রাখা মোটেই উচিৎ নয়। গাছে রোগাক্রান্ত, মরা, শুকনা ও দুর্বল ডাল থাকলে তা ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। তাছাড়া ফলবান গাছের ভিতরমুখী ডালে সাধারনত ফুল ফল হয় না, তাই এ ধরণের ডালপালা ছাঁটাই করে ফেলা ভাল। ছাঁটাই এমনভাবে করতে হবে যাতে গাছের ভিতরে সর্বাধিক পরিমাণ সূর্যালোক পৌঁছতে পারে। কোন ডাল যদি পাশের গাছে ছায়া দেয় তবে এ সকল ডাল কেটে ফেলা উচিত। এছাড়া আম পাড়ার সময় মুকুল দন্ডটি ভেঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ফলবান গাছের বৃদ্ধি কমে গেলে অথবা ফলের আকার ছোট হলে

ডালপালা ছাঁটাইকরণ করতে হয়। ফল সংগ্রহ করার পর পরই ডালপালা ছাঁটাইকরণ করতে হবে এরপর গাছের বয়স অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। ডালের কাটা অংশে বোর্দোপেষ্ট (১০০ গ্রাম তুঁত, ১০০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানি) এর প্রলেপ দিতে হবে অন্যথায় ক্ষতস্থান দিয়ে নানা ধরণের রোগের আক্রমণ হতে পারে। এই পেষ্ট তুলির মাধ্যমে ডালের কাটা অংশে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র: ডালপালা ছাঁটাইকৃত গাছ

গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলমের গাছের বয়স ২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্তপুষ্পমূকুল ভেঙ্গে দিতে হবে। কারণ প্রথম বছর থেকে বা লাগানোর পর হতে আম নেওয়া শুরু করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে সুন্দর কাঠামোর গাছ তৈরি করা সম্ভব হয় না।

ফল সংগ্রহ

গাছে কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ করে তখনই আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাকি দিয়ে না পেড়ে গাছ থেকে হাত দিয়ে এবং বড় গাছ থেকে জালিযুক্ত বাঁশের দণ্ডের সাহায্যে পাকা আম সংগ্রহ করা ভাল। গাছের নিচে কাপড়ের বড় চাদর ধরে রেখে তাতে আম সংগ্রহ করা উত্তম।

ফলন

আমের ফলন গাছের বয়স ও জাত ভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ৪ বছর বয়সের গাছে ২০-২৫ টি, ১০ বছর বয়সের গাছে ২৫০-৪০০ টি এবং পূর্ণ বয়স্ক গাছে ৮০০-১০০০ টি আম ধরে থাকে। তবে আমগাছের ফলন বাগানের অবস্থান, গাছের বয়স ও বাগান ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

আমের ক্ষতিকর পোকাসমূহ ও এর দমন ব্যবস্থাপনা

এ দেশে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। শুধুমাত্র পোকার আক্রমণের জন্য আমের ফলন শূন্যের কোঠায় পৌঁছতে পারে। অনুকূল আবহাওয়ায় পোকার বংশবৃদ্ধি ব্যাপক হারে বেড়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে আক্রমণ ঘটায়। তাই আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে পোকামাকড় দমন অপরিহার্য। আমের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা, ক্ষতির ধরণ এবং দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো;

ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit borer)

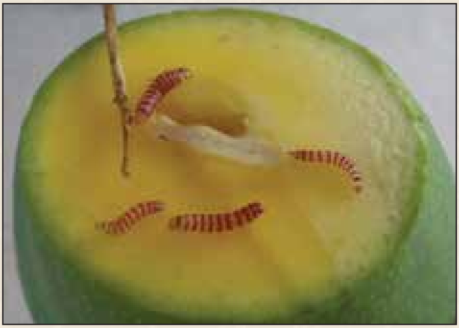

চিত্র: আমের ভিতর ফল ছিদ্রকারী পোকার লার্ভা

বর্তমানে আম চাষীদের নিকট এ পোকা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আম মার্বেল আকারের হলেই এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আমের আঁটি শক্ত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা আমের নিচের অংশে ডিম পাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়া আম ছিদ্র করে আমের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং আমের শাঁস খেতে থাকে ফলে আক্রান্ত স্থানটি কালো হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানে জীবাণুর আক্রমণের ফলে পচন ধরে যায়। কোন কোন সময় পঁচনকৃত জায়গা হতে ফ্যানা বের হয়। বেশী আক্রান্ত আম ফেটে যায় এবং গাছ থেকে পড়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

আমবাগান পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে। মাঝে মাঝে আমবাগান পরিদর্শন করতে হবে। আক্রান্ত আম সংগ্রহ করে মাটির গভীরে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ দেখা দেয়া মাত্র সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. অথবা রিপকর্ড প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. হারে স্প্রে করতে হবে। আমের প্রকৃতিক ঝরা বন্ধ হলে অথবা গুটির বয়স ৪০ দিন হলে ব্যাগিং করতে হবে, এতে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মাছি পোকা (Fruit fly)

চিত্র: আমের মাছি পোকা

মাছি পোকা পরিপক্ব আমের জন্য বেশ ক্ষতিকর হলেও এ পোকা কাঁচা আমের জন্য তেমন ক্ষতিকারক নয়। ফজলি, ল্যাংড়া, খিরসাপাতসহ গুটিজাতীয় বিভিন্ন জাতের পাকা আমে এ পোকাটির আক্রমণ হয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় মাছি পোকার আক্রমণ বুঝা যায় না তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আক্রান্ত আমের গায়ে ডিম পাড়ার স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। ক্ষত স্থানটি কিছটা বিবর্ণ হয়ে যায়। আক্রান্ত আম পাকা শুরু হলে এ আক্রান্ত স্থান থেকে রস ঝরতে দেখা যায়। পাকা আম কাটলে আক্রান্ত আমের শাঁসের ভিতর সাদা সাদা পোকার কীড়া দেখা যায়। এ পোকায় আক্রান্ত আম অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় বা পঁচে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

চিত্র: আম গাছে ব্যাগিং প্রযুক্তির ব্যবহার

আম গাছে না পাকিয়ে কাঁচা কিন্তু পরিপক্ব আম বাড়িতে নিয়ে এসে পাকালে এ পোকার আক্রমণ কমানো যাবে। তাছাড়া মাছি পোকাক্রান্ত আম সনাক্ত করতে পারলে সে আম সংগ্রহ করে মাটির নিচে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। আম পাকার মৌসুমে (আম সংগ্রহ করার ৩০-৩৫ দিন পূর্বে) প্রতিটি আম কাগজ (ব্রাউন পেপার ব্যাগ) দ্বারা মুড়িয়ে দিলে আমকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে। সঠিক সময়ে ব্যাগিং করলে এই পোকাটির আক্রমণ শতভাগ কমানো যায়। ব্যাগিং প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে বেশ ভালোভাবেই আমচাষীরা ব্যবহার করছেন এবং মাছি পোকার আক্রমণমুক্ত আম উৎপাদন করছেন। কম বয়সী আমগাছে খুব সহজেই এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যাবে।

বর্তমানে আমচাষীরা বিশেষ ধরণের মই ব্যবহার করে ৩০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত গাছে সফলভাবে ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। আমবাগানে মিথাইল ইউজেনল (Methyl Eugenol) ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে অনেক পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে এবং বাগানে মাছি পোকার আক্রমণ কমে যাবে।

এ্যাপসিলা পোকা (Shoot-gall psyllid)

এ্যাপসিলা আমের একটি ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার আক্রমণ হঠাৎ করে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও দেখা যায়। চাঁপইনবাবগঞ্জ জেলায় এটি তাবিজ পোকা নামে পরিচিত। এ পোকার আক্রমণ হলে গাছের বৃদ্ধি ও আমের উৎপাদন কমে যায়। কচি পাতায় পাড়া ডিমের ভিতর ভ্রুনাবস্থায় থাকা প্রথম ধাপের নিম্ফ পাতার ভিতর থেকে রস চুসে খায় এবং এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যার কারণে পত্রকক্ষে সূঁচালো মুখবিশিষ্ট সবুজ রঙের মোচাকৃতি গলের সৃষ্টি হয়। এই গল সৃষ্টি হওয়ার কারণে পত্রকক্ষে আর কোন নতুন পাতা বা মুকুল বের হতে পারে না। গাছে বেশি পরিমানে গল সৃষ্টি হলে গলযুক্ত ডগা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং কাঙ্খিত ফল ধারণ ব্যাহত হয়।

চিত্রঃ এ্যাপসিলা পোকা দ্বারা আক্রান্ত ডগা

দমন ব্যবস্থাপনা

মার্চ-এপ্রিল মাসে আম গাছের পাতায় এ্যাপসিলা পোকার ডিম পাড়ার ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলে প্রতি লিটার পানির সাথে কার্বারিল/ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন যে কোন একটি গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত হারে মিশিয়ে পাতা ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নিম্ফসহ গল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।

কাণ্ডের মাজরা পোকা (Stem borer)

চিত্র: কান্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ

কাণ্ডের মাজরা পোকা আম গাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ পোকা আমগাছের কাণ্ড বা শাখাকে আক্রমণ করে। চারাগাছে এ পোকার আক্রমণ হলে চারা গাছটি মারা যেতে পারে। বাংলাদেশের সর্বত্রই আমগাছে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

স্ত্রী পোকা কাণ্ডের ভিতর একটি একটি করে ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি এক প্রকার আঠালো পদার্থ দ্বারা ঢেকে রাখে। ডিম থেকে কীড়া বের হওয়ার পর কীড়াগুলি শাখার ভিতর সুড়ঙ্গ করে ভিতরে ঢুকতে থাকে এবং এক প্রকার শুকনা ও শক্ত বলের মত মল নির্গত করে। কাণ্ড বা শাখায় সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়ার কারণে কাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোন কোন সময় অল্প বাতাসে ভেঙ্গে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

গাছের কাণ্ড বা শাখায় কোন ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ দেখতে পাওয়া গেলে ঐ সুড়ঙ্গে সূঁচালো লোহার শিক বা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে পোকাটির কীড়াকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে হবে। সুড়ঙ্গটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে তার মধ্যে ৫-৬ মিলি লিটার কেরোসিন বা পেট্রোল বা নগসে ভিজানো তুলা ঢুকিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ কাদা দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

পাতার গল মাছি (Leaf gall midge)

বিভিন্ন প্রজাতির গল সৃষ্টিকারী পোকা আম গাছের পাতায় আক্রমণ করে। আমাদের দেশে গল মাছির আক্রমণ তেমন ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছেনা। তবে পাতায় গলের পরিমাণ বেশী হলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। স্ত্রী পোকা আমের কচি পাতার নিচের দিকে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ম্যাগোট বা বাচ্চা পোকা বের হয়। পরে পাতার কোষ এবং টিস্যুসমূহে প্রবেশ করে রস খাওয়ার কারণে পাতায় গলের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের মতে গলমাছি মার্চ মাসে দেখা

যায় এবং মোট ১-৩ বার বংশ বৃদ্ধি করে। ছোট গলমাছি আম গাছের কচি পাতায় আক্রমণ করে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের গলের সৃষ্টি হয়। পাতার উপর কিংবা নিচের পৃষ্টে কিংবা উভয় পৃষ্টে সৃষ্ট গলগুলি বেশ শক্ত। বিভিন্ন প্রজাতির পোকা বিভিন্ন রঙের গল সৃষ্টি করে থাকে, যেমন- ধূসর, বাদামী, সবুজ, লাল ইত্যাদি।

চিত্র: গল মাছি দ্বারা আক্রান্ত পাতা দেখানো হয়েছে

দমন ব্যবস্থাপনা

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর আক্রান্ত পাতায় একাধিকবার স্প্রে করলে আমের পাতায় গল মাছি দমন করা যায়। ছায়াযুক্ত আম বাগানে ও ঘনভাবে রোপণকৃত আম গাছের পাতায় গলের আক্রমণ কিছুটা বেশি হয়। এ জন্য আম পাড়ার পরে কিছু ডালপালা ছাঁটাই করা ভালো।

পাতা কাটা উইভিল (Leaf cutting weevil)

নার্সারীতে চারা গাছের কচি পাতায় এই পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ছোট, ধূসর বাদামী রঙের উইভিল যার লম্বা বাদামী রঙের শুঁড় ও কালো রঙ এর শক্ত পাখা আছে। এরা বছরে কমপক্ষে ৩ বার বংশ বৃদ্ধি করে। এ পোকা আম গাছের শুধু কচি পাতা কেটে ক্ষতি করে। কচি পাতার নিচের পিঠে মধ্যশিরার উভয় পার্শ্বে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে। পরে স্ত্রী পোকা ডিমপাড়া পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে দেয়। এই ভাবে একটি গাছ পাতাশূন্য হয়ে যায়।

চিত্র: পাতা কাটা উইভিল দ্বারা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা

কর্তিত কচি পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে কচি পাতা বের হওয়ার ৫-৬ দিন এবং ১২-১৩ দিন পর পর দু' বার কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক যেমন সেভিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা যে কোন কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। তবে সকাল বেলায় স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। নার্সারীতে কচি পাতা বের হওয়ার সময় প্রতিটি কলম/গাছ পলিথিন বা কাগজের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে রেখে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মিলিবাগ/ ছাতরা পোকা (Mealybug)

চিত্র: মিলিবাগ পোকা দ্বারা আক্রান্ত আম

আম গাছে ও আম পাতায় মিলিবাগ এর আক্রমণ দেখা যায়। তবে এ পোকার আক্রমণে গাছ ও গাছের ফল নষ্ট হতে পারে। এই পোকার আক্রমণ আমের কচি পাতায়, কচি ডগায়, বয়স্ক পাতায় ও আমে লক্ষ্য করা যায়। এরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে কচি পাতা ও কচি ডগার রস শোষণ করে খায় ফলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ছবিতে মিলিবাগ দ্বারা আক্রান্ত আম এবং আমের গাছ দেখানো হয়েছে। বাগানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই পোকা দমনের জন্য যে কোন স্পর্শক কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সেমিলুপার (Semilooper)

সব বয়সের আম গাছে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে মনে হবে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ পোকার লার্ভা বর্ধনশীল ডগার বাকল ও কচি পাতা

খেয়ে নষ্ট করে থাকে। মানুষের শব্দ পেলেই এরা ডগার সাথে লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে।

চিত্র: সেমিলুপার দ্বারা আক্রান্ত ডগা

পরবর্তীতে জায়গাটি কালো হয়ে যায় এবং এবং চারা বা কলমের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ডগাসমূহ কেটে ফেলতে হবে। এই পোকা দমনের জন্য যে কোন স্পর্শক কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে যেমন- কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক (সেভিন ৮৫ ডব্লিওপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাতাখেকো শুঁয়ো পোকা

এ পোকার আক্রমণে গাছ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। শুয়োঁ পোকা পত্রফলক সম্পূর্ণ খেয়ে শুধু মধ্যশিরাটি বা পার্শ্বশিরাগুলো রাখে। আক্রান্ত গাছে অসময়ে নতুন বিটপ বের হয় ফলে গাছে ফুল আসে না।

দমন ব্যবস্থাপনা

চিত্র: পাতাখেকো শুঁয়ো পোকা আক্রান্ত পাতা

পূর্ণতা প্রাপ্ত শুয়োঁ পোকা কীটনাশক প্রয়োগে মেরে ফেলা খুব কঠিন বিধায় আম গাছে শুয়োঁ পোকার ছোট ছোট কীড়া দেখা মাত্র সেগুলো পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন কনফিডর ৭০ ডব্লিউজি ০.৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

আম বাগানের প্রধান রোগসমূহ ও এর দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে আম একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। অন্যান্য ফসলের মত আমেও বেশ কিছু রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা আমের উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে রোগবালাই দমন অপরিহার্য। আমের প্রধান রোগসমূহ এবং এর দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

এ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)

বাংলাদেশসহ সকল আম উৎপাদনকারী দেশে আমের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হলো এ্যানথ্রাকনোজ। *Colletotrichum gloeosporioides* নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংগঠিত হয়। এ রোগের আক্রমণ আমগাছের কচি পাতা, কাণ্ড, মুকুল, কুঁড়ি ও বাড়ন্ত আমে দেখা যায়। পাশাপাশি দাগসমূহ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। বেশি আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে। কচি পাতার আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি দ্রুত মারা যায়। আমের মুকুল বা ফুল আক্রান্ত হলে কালো দাগ দেখা দেয়। আক্রান্ত ফুল মারা যায় ও ঝরে পড়ে। মূকুলে আক্রমণ হলে ফল ধারণ ব্যাহত হয়। আম ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে আমের গায়ে কালো দাগ দেখা দেয়। আক্রান্ত ছোট আম ঝরে পড়ে। পরিপক্ব আমে কালো দাগ পড়লে বাজার মূল্য কমে যায়।

চিত্র: এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত পাতা ও ফল

প্রতিকার

- প্রতি বছর রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও আম সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।

- মুকুলে রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ডায়থেন এম-৪৫/পেনকোজেব/ইন্ডোফিল এম-৪৫ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। মূকুল ১০-১২ সেমি লম্বা হলেই প্রথম স্প্রে শেষ করতে হবে। আম মটর দানার মত হলে দ্বিতীয় বার স্প্রে করতে হবে। এতে কচি আমে আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং আম ঝরে পড়া কমবে। কীটনাশকের সাথে এসব ছত্রাকনাশক মিশিয়ে একত্রে স্প্রে করা যেতে পারে।
- গাছ থেকে আম পাড়ার পরপরই গরম পানিতে আম শোধন (৫৫° সেঃ তাপমাত্রায় ৫ মিনিট ডুবিয়ে) করার পর শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে।

গামোসিস বা আঁঠাঝরা (Gummosis)

গামোসিস রোগের সংক্রমণ খুব অল্প বয়স্ক (১-৫ বছর) এবং বয়স্ক (৪০-১০০ বছর) গাছে বেশি দেখা যায়। এ রোগের সংক্রমণ বর্তমান সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। *Lasiodiplodia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সংক্রমণের প্রথমিক পর্যায়ে গাছের প্রধান কাণ্ড হতে থেকে এক প্রকার আঁঠালো রস বা আঁঠা বের হয়। আক্রান্ত বাকলের কিছু কিছু জায়গা ফেটে যেতে পারে। আঁঠাঝরার পরিমাণ বেড়ে গেলে আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয় ও পরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত ডগাটি শুকিয়ে মারা যায়। কোন কোন সময় মরা ডালের পাতা ঝরে না পড়ে ডালের সাথে লেগে থাকে। আক্রান্ত গাছ ক্রমান্বয়ে মারা যায়।

চিত্র: গামোসিস রোগাক্রান্ত আম গাছ

প্রতিকার

- আম গাছ ও বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বছরে দু'বার মরা ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই মরা ডালপালা গাছে না থাকে।
- নিয়মিত পরিচর্যা যেমন: সুষম সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ ও পোকা দমন করতে হবে।
- আক্রান্ত ডগা বা শাখা- প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে এবং কার্তিত অংশে বোর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে।
- আক্রান্ত গাছে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (নোইন/ফরাষ্টিন ইত্যাদি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে পাতা, ডাল এবং গাছের গুঁড়ি ৭-১০ দিন পর পর ৮/১০ বার ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। সুফল পেতে সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পাউডারী মিলডিউ (Powdery mildew)

Oidium mangiferae নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা পাউডারী মিলডিও রোগ হয় । এ রোগের সংক্রমণ প্রধানত আমের মূকুল ও কচি আমে দেখা যায়। প্রথমে আমের মুকুলের শীর্ষ প্রান্তে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় এই পাউডার সম্পূর্ণ মূকুলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুলের সমস্ত ফুল নষ্ট হয়ে যায়। বেশি আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

চিত্র: পাউডারি মিলডিও দ্বারা আক্রান্ত পুষ্পমুঞ্জুরী

প্রতিকার

- ❀ মুকুল আসার সময় প্রতিদিন আম গাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই সালফার বা গন্ধক জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- থিওভিট/কুমুলাস প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

আগামরা (Die back)

মার্চ-এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই আগামরা রোগের সংক্রমণ দেখা যায়। *Colletotrichum gloeosporioides* নামক ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। প্রথমে সংক্রমণ কাণ্ডের শীর্ষদেশে প্রকাশ পায় এবং সে লক্ষণ উপরের দিক থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে বলে এ রোগকে আগামরা নামে আখ্যায়িত করা হয়। রোগের আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং গাছের ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

চিত্র: আগামরা রোগে আক্রান্ত গাছ দেখানো হয়েছে

প্রতিকার

- ❀ আক্রান্ত ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দোপেষ্টের প্রলেপ দিতে হবে।
- ❀ গাছে নতুন কুশি বা পাতা বের হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ডায়থেন এম- ৪৫/ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করতে হবে।

বোঁটা পচা (Stem-end rot)

বোঁটা পচা আমের সংগ্রহোত্তর একটি মারাত্মক রোগ। *Botryodipldia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়। প্রথমে বোঁটায় বাদামী অথবা কালো দাগ দেখা দেয়। জীবাণু ফলের

চিত্র: পাকা আমে বোঁটা পচা রোগের লক্ষণ

শাঁসকে আক্রমণ করে এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে আমের কোষগুলোকে দ্রুত পচায়ে ফেলতে পারে। আক্রান্ত আম ২/৩ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। উচ্চ তাপ এবং আর্দ্র আবহাওয়া রোগের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

- মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে। আম পাড়ার সময় যাতে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ১ ইঞ্চি বোঁটাসহ আম পাড়লে রোগের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে য়ায়।
- আম সংগ্রহ করার পর গাছের তলায় জমা না রেখে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- আম সংগ্রহ করার পর পরই গরম পানিতে (৫৫° সে. তাপমাত্রার পানিতে ৫-৭ মিনিট) অথবা ব্যাভিস্টিন দ্রবণে (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে) ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর গুদামজাত করলে বোঁটা পচার ভয় থাকেনা।

দাদ (Scab)

Elsinoe mangiferae নামক ছত্রাকের এর কারণে আমে দাদ রোগ পরিলক্ষিত হয়। আমের আকার মটর দানার মত হলেই এ রোগের সংক্রমণ শুরু হতে পারে। আক্রান্ত আমের শরীর বাদামী রং ধারণ করে, খোসা ফেটে যায় ও খসখসে হয়ে উঠে। আক্রান্ত আমের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ফল ঝরে পড়ে।

চিত্র: আমে দাদ রোগের লক্ষণ

প্রতিকার

রোগের আক্রমণ বেশি হলে বা ছোট আম আক্রান্ত হলে রোভরাল বা কুপ্রাভিট নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ৭ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লাল মরিচা (Red rust)

চিত্র: পাতায় লাল মরিচা রোগের লক্ষণ

Cephaleuros virescens নামক শৈবাল এর আক্রমণে লাল মরিচা রোগ হয়। লাল মরিচা রোগ প্রধানত পাতায় দেখা যায়। দাগের মধ্যে অবস্থিত শৈবালের দেহ কিছুটা মখমলের মত কোমল মনে হয়। অধিক তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা এ রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখে বলে বর্ষাকালে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাতের আমগাছ লাগাতে হবে। রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বর্ষা শুরু হলে বোর্দো মিক্সার (১০ গ্রাম তুঁতে ও ১০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে) বা কুপ্রাভিট (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) ১৫ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

বিকৃতি (Malformation)

আক্রমণের স্থান অনুযায়ী বিকৃতি দুই প্রকার। যথা- মুকুলের বিকৃতি (floral malformation) ও দৈহিক বিকৃতি (vegetative malformation)।

চিত্র: দৈহিক ও মুকুলের বিকৃতি

বিকৃত মুকুলে ফল ধারণ হয় না তাই ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। দৈহিক বিকৃতি কেবল চারা গাছ বা ছোট গাছে দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত চারা গাছ মারা যেতে পারে। *Fusarium moniliforme var. subglutinans* নামক ছত্রাক এ রোগের প্রকৃত কারণ বলে বিজ্ঞানীরা ঐক্যমত পোষন করেছেন।

প্রতিকার

- রোগমুক্ত গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হবে এবং কলম তৈরি করার সময় রোগমুক্ত গাছ থেকে ডগা বা সায়ন (scion) সংগ্রহ করতে হবে।
- রোগমুক্ত এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের আমগাছ লাগাতে হবে।
- বিকৃত মুকুল দেখা দেওয়া মাত্রই কেটে ফেলতে হবে।
- মুকুল বের হওয়ার প্রায় ৩ মাস পূর্বে (অর্থাৎ অক্টোবর মাসে) ন্যাপথালিন এসিটিক এসিড (NAA) শতকরা ০.০২ ভাগ অর্থাৎ ১০ লিটার পানিতে ২০০ মিলিগ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়।
- দৈহিকভাবে বিকৃত কুঁড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে অথবা আক্রান্ত স্থান কেটে ফেলতে হবে।

আম সংগ্রহ, প্যাকিং, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ

আম সংগ্রহ

আমকে আমরা দু'অবস্থায় সংগ্রহ করতে পারি যেমন: কাঁচা এবং পাকা অবস্থায়। আমগাছ হতে আমকে দু'ভাবে সংগ্রহ করা যায়, হাত দিয়ে এবং সংগ্রাহক ব্যবহার করে। আম গাছের উচ্চতা কম হলে আম সহজেই হাত দ্বারা পাড়া সম্ভব কিন্তু গাছ বড় হলে বা উচ্চতা বেশি হলে বাঁশের তৈরি আম সংগ্রহক বা ঠুসি (mango harvester) ব্যবহার করা হয়। গাছ থেকে কখন আম পাড়তে হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। পরিপূর্ণ পুষ্টতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত গাছ থেকে আম পাড়া উচিত নয় কারণ অপুষ্ট আম ঠিকমত পাকেনা ও সঠিক রঙ ধারণ করে না। উপরন্ত উপরের খোসা কুঁচকে যায়। পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট (mature) হলে আমের উপরের অংশ অর্থাৎ বোঁটার নিচের ত্বক সামান্য হলুদাভ রঙ ধারণ করবে। আমের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০১ - ১.০২ এর মধ্যে থাকবে অর্থাৎ পরিপক্ব আম পানিতে ডুবে যাবে। প্রাকৃতিকভাবে দু একটা পাকা আম গাছ থেকে ঝরে পড়বে এবং পাখি আধাপাকা আম ঠোকরাবে।

সতর্কতা

- বেশিরভাগ আমে পরিপক্বতা এলেই গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- আম এমনভাবে সংগ্রহ হবে যেন কোন আঘাত না পায়।
- গাছ থেকে আম পাড়ার ১৫/২০ পূর্বে আমগাছে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক স্প্রে করা বন্ধ করতে হবে।
- আমকে কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখতে হবে যাতে আঁঠা ঠিকমত ঝরে পড়ে ও আমের গায়ে না লাগতে পারে।
- গাছের নীচ থেকে আম দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে দফায় দফায় আম পাড়া যেতে পারে।

বাছাইকরণ বা গ্রেডিং

সংগৃহীত আমের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বাছাইকরণ একান্ত প্রয়োজন। আঘাতপ্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত, পোকার দ্বারা আক্রান্ত এবং গাছ পাকা আম পৃথক করে রাখতে হবে কারণ এসব আম খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের

জন্য স্বাভাবিক, উজ্জ্বল এবং পরিপুষ্ট আম বাছাই করে প্যাকিং করা উচিত। যে কোন ফল প্যাকিং এর আগে ছোট, মাঝারি এবং বড় এই তিন ভাগে ভাগ করা উচিত যাতে প্যাকিং, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সুবিধা হয়।

প্যাকিং

চিত্র: ক্রেটে আম সাজানো

আম সংগ্রহের পর ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর জন্য আমের যে ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকে প্যাকিং বলে। আম দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য প্যাকিং একান্ত প্রয়োজন। সামান্য আঘাতে ক্ষত হতে পারে এবং তাতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। আম প্যাকিং এর সময় নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা উচিত। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো প্লাস্টিকের ক্রেটে আম পরিবহন করা। প্লাস্টিক ক্রেট এর গায়ে খবরের কাগজ দিয়ে লাইনিং করে এবং প্রতিটি আমকে টিস্যু পেপার বা খবরের কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া ভালো। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে ফলের নাম, জাতের নাম, প্রাপকের নাম ইত্যাদি লিখে রাখা উচিত। প্যাকিং এর আগে আমকে গরম পানিতে ট্রিটমেন্ট করলে আমের সংরক্ষণকাল ৫-৭ দিন বৃদ্ধি পায় এবং আমের রঙ কিছুটা হলুদ হয় এবং বেশ কিছুদিন রোগমুক্ত থাকে।

পরিবহন

আমাদের দেশে প্রধানত সড়ক পথেই আম পরিবহন করা হয় কারণ এতে সময় কম লাগে। তাছাড়া বাগান থেকে বাজারে আম পরিবহনের জন্য অটোরিক্সা, ট্রলি, ভ্যান, নৌকা ও গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: আম পরিবহন পদ্ধতি

আম পরিবহনে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

- যানবাহনে আম উঠানো, নামানো ও পরিবহনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন ফলের গায়ে বা প্যাকেটে আঘাত না লাগে।
- পরিবহনে বেশি সময় নষ্ট না করাই ভাল কারণ তাতে আম পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- পরিবহন শেষে প্যাকেট খোলা ও আম গুদামজাত করা উচিত।
- গাদাগাদি করে আম পরিবহন করলে নিচের আমে বেশি চাপ পড়ে ও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গুদামজাতকরণ

গাছ থেকে আম পাড়ার পর বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আমকে গুদামজাত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যে কোন ফল গাছ থেকে পাড়ার পরও তার মধ্যে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। তাই আম গুদামজাত করার সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চিত্র: স্থানীয় বাজারে আম বিক্রয় পদ্ধতি

- যে ঘরে আম রাখা হবে তা অবশ্যই বাতাস চলাচলের উপযোগী ও শীতল হতে হবে। প্রয়োজনে ইলেকট্রিক ফ্যান বাবহার করা যেতে পারে।
- আর্দ্র আবহাওয়ায় ও বদ্ধ ঘরে আম তাড়াতাড়ি পাকে এবং সহজে পচন ধরে যায়। তাই পাকা আম বেশি দিন গুদামে সংরক্ষণ না করে তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজারজাতকরণ

যে কোন জিনিস বাজারজাতকরণ একটি সুন্দর শিল্প। দক্ষ ব্যবসায়ীগণ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন যাতে ক্রেতাসাধারণ অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। আম বাজারজাতকরণের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা উচিত।

- বেশি পাকা আম আগে বিক্রয় করতে হবে।
- কোন আমে পঁচন দেখা মাত্রই আলাদা করে রাখতে হবে, কারণ এর জীবাণু অন্যান্য সুস্থ আমকে সংক্রমণ করতে পারে।
- ছোট, মাঝারি ও বড় তিন সাইজের ফল বাছাই করে বাজারজাত করতে হবে ।

পরিশেষে বলা যায়, একটি মানব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে তার প্রতি প্রদত্ত যত্ন ও পরিচর্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একটি আম গাছ বা আম বাগানের উপর আমাদের যত্ন ও পরিচর্যার উপর নির্ভর করবে আমবাগান থেকে আমরা কতটুকু আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবো। তাই এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, আম গাছের প্রতি পরিচর্যা বাড়াতে পারলে ভালোমানের আম উৎপাদন নিশ্চিত হবে এবং আমরা বেশি লাভবান হতে পারবো।

আমবাগানে বালাইনাশকের ব্যবহারে স্প্রের নীতিমালা ও করণীয়

ফল-ফসলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে বালাইনাশকের পরিকল্পিত ব্যবহার কৃষিতে নতুন কোন বিষয় নয়। তবে বর্তমান সময়ে এই ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ মন্ডলের আবহাওয়া বিরাজমান এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে রোগ-বালাই তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে। উচ্চ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিকাংশ ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের জীবাণুর প্রজনন ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে ফসল উৎপাদনে প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা। ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে এগুলোর দমন অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি হয়ে পড়ে এবং এর দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমাদের চাষীরা। প্রায় সব ধরনের ফল-ফসলে বালাইনাশক ব্যবহারের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চিন্তার বিষয় হলো পছন্দনীয় এই ফলটি উৎপাদনের জন্য বহুবার বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। গত কয়েক বছর আগেও আমবাগানে ২-৩ বার বালাইনাশক ব্যবহার করে আশানুরুপ ফলন পাওয়া গেছে। কিন্তু আবহাওয়াগত পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-৩০ বারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরও বেশি। আমের মৌসুম শুরুর আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় আম গাছে স্প্রে। কেউ শুরু করেন অন্যকে দেখে দেখে, কেউবা শুনে শুনে আর কিছু সংখ্যক কৃষক স্প্রে করেন প্রয়োজনে। এছাড়াও আম বাগানে স্প্রের আর একটি কারণ হলো আমবাগান কেনাবেচা হয় ৪-৫ বার এবং প্রত্যেক ক্রেতাই প্রত্যাশা করেন অধিক মুনাফা লাভের। এসব কারণে বাড়তে থাকে আম বাগানে স্প্রের সংখ্যা। বর্তমানে আমবাগানে ককটেলের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে এই ককটেল বলতে একাধিক কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও হরমোনের একত্রে নিম্ন মাত্রায় ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে, এই ককটেল কখনও কার্যকরী হতে পারে না। তাঁদের মতে, যে কোন বালাইনাশকে যদি পরিমিত মাত্রায় কার্যকরী উপাদান থাকে এবং সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তাহলে নির্দিষ্ট বালাইনাশক নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। তবে চাষীদের মতে, একটি কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট পোকামাকড় ও রোগ দমনে কার্যকরী না হওয়ায় তারা ককটেল ব্যবহার করে থাকেন। বালাইনাশক ব্যবহার করে কাঙ্খিত ফলাফল পেতে অবশ্যই স্প্রের মূলনীতি ভালোভাবে জানা এবং তা সঠিকভাবে অনুসরণ করা উচিৎ।

স্প্রের মূলনীতি

স্প্রের সুফল পেতে হলে যে কোন বালাইনাশক স্প্রে করতে ৪ (চার) টি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এগুলো হলো: সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন, সঠিক মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক সময় নির্বাচন এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ।

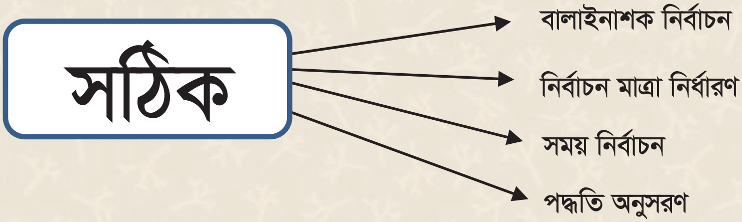

সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন

আমের রোগ বা ক্ষতিকর পোকা লাভজনকভাবে ও কম খরচে দমন করতে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঔষধ নির্বাচনে কোন ভুল হয়ে থাকলে স্প্রে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ভেস্তে যায়। এতে শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে উপরন্ত আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। অনেক কৃষক কীটনাশক ডিলারদের ঔষধ নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ চান, এটা মোটেই ঠিক নয়। এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মী বা আম গবেষণা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা উচিত। একই কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক বার বার স্প্রে না করে মাঝে মাঝে ঔষধের গ্রুপ পরিবর্তন করা উচিত কারণ একই ঔষধ বার বার স্প্রে করলে পোকা বা রোগ জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে।

সঠিক মাত্রা নির্ধারণ

সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। বালাইনাশকের মাত্রা কম বা বেশি না হওয়াই উত্তম। উপযুক্ত মাত্রা না হলে রোগ বা পোকামাকড় ভালোভাবে দমন করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু রোগের জীবাণু বা পোকার মধ্যে বালাইনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। আবার অধিক মাত্রায় বালাইনাশকের ব্যবহার অর্থের অপচয় হয় এবং ফলগাছের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই বালাইনাশকের মাত্রার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লিখিত নির্দেশনা, কৃষি বিজ্ঞানীদের এবং কৃষি কর্মীর পরামর্শমত স্প্রে করা উচিত।

সঠিক সময় নির্বাচন

কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। এ কথা সত্য যে কোন কাজ সঠিক সময়ে সমাধান করতে পারলে বাড়তি শ্রম ও বাড়তি খরচের অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আম গাছে মুকুল আসার পর থেকে ফলধারণ পর্যন্ত সময়টুকু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে রোগ বা পোকার আক্রমণ হলে গাফিলতি করা মোটেই ঠিক নয়। এ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে আমগাছে ফলধারণ নাও হতে পারে। আমের মুকুল ১০-১২ সে. মি. হলেই প্রথম স্প্রে দেওয় উচিত। মুকুলের ফুল ফোটার পর কোন অবস্থাতেই স্প্রে করা যাবেনা। আমের পরাগায়ণ প্রধানত বিভিন্ন প্রজাতির মাছির দ্বারা হয়ে থাকে। তাই ফুল ফোটার সময় কীটনাশক স্প্রে করলে মাছি মারা যেতে পারে এবং আমের পরাগায়ণ ও ফলধারণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। গাছ থেকে ফল পাড়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে গাছে কোন বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়। গাছে মুকুল বের হওয়ার আগেই অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে প্রয়োজনীয় অর্থ, শ্রমিক, স্প্রে যন্ত্রপাতি, ঔষধ ইত্যাদি মজুদ রাখতে হবে।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ

সঠিক ঔষধ, সঠিক মাত্রা, সঠিক সময় ইত্যাদি নির্ধারণের পর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। স্প্রে কার্যক্রম থেকে পরিপূর্ণ ফল লাভ করতে হলে অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে স্প্রে করতে হবে। ফলের মধ্যে বা ডালের মধ্যে ছিদ্রকারী পোকা অবস্থান করলে বাইরে কীটনাশক স্প্রে করলে কোন লাভ হয় না। আমের হপার পোকা সুষ্ঠুভাবে দমন করতে হলে পাতায় স্প্রে করার সাথে সাথে গাছের ডালপালাসহ গুড়িতেও স্প্রে করা প্রয়োজন। তাই সুষ্ঠুভাবে রোগ বা পোকা দমনের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস বা আম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের সাথে আলাপ করে পরামর্শ নেয়া উচিত।

পোকামাকড় ও রোগ দমনে প্রথমে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ করা উচিৎ। অতিরিক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার যেমন ফসলের উৎপাদনকে ব্যয় বহুল করে তেমনি সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটায়। এছাড়াও আমাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপকারী ও বন্ধু পোকাকে ধ্বংস করে ফলে শত্রু পোকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন ফলে পরাগায়ণে সহায়ক পোকার অভাবে ফলধারণ ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। অধিক বালাইনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত ফল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায় রোগ ও পোকামাকড় দমনে স্প্রের নিয়মনীতি অনুসরণ করে বালাইনাশক ব্যবহার করবেন চাষীরা এমনটাই প্রত্যাশা। আমরা আশাকরি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় দেশে উৎপাদিত হবে গুণগত মানসম্পন্ন ফল-ফসল যা নিশ্চিন্তে ভোগ করবেন দেশের সাধারণ জনগণ।

আম রপ্তানির সম্ভাবনা, প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

আম একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে এটি একটি পছন্দনীয় ফল। কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি এবং পাকা আমে প্রচুর ভিটামিন-এ রয়েছে। ভিটামিন ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ এ ফল। ফল খাওয়ার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে এবং বিদেশে ফলের বাজারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের দেশিয় জাতগুলো নিয়ে বিদেশের বড় বড় চেইন মার্কেটে প্রবেশ করা প্রথমে কিছুটা কষ্টকর হবে। তবে বিদেশে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী বসবাস করছেন, তাদের নিকট আমরা যদি বাংলাদেশী সুস্বাদু আম পৌঁছাতে পারি তাহলে একটা ভালো বাজার দখল করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের (Ethnic market) নিকট অল্প পরিমাণ আম রপ্তানি করা হচ্ছে, তবে তা বৃদ্ধি করা এবং বেশি পরিমাণে আম রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বারি আম-২, বারি আম-৩, বারি আম-৪, খিরসাপাত, এবং বারি আম-৭ এই ৫টি জাতের বিদেশে রপ্তানির বৈশিষ্ট বিদ্যমান। বর্তমানে জাতগুলো রপ্তানিরর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ আমাদেরকে নিতে হবে। দেশিয় কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমের ঘনীভূত জুস আমদানি করে থাকে। দেশে আম এবং জুস উৎপাদন বাড়াতে পারলে ঘনীভূত জুস আমদানি রোধ করা সম্ভব হবে। তাজা আম রপ্তানিতে কিছুটা অসুবিধা থাকলেও প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা অনেকটাই সুবিধাজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০.২২ লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়। এর প্রায় সবটুকুই এদেশের মানুষ বিভিন্নভাবে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পৃথিবীর মোট চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ আম রপ্তানি করে থাকে। এদেশের আম রপ্তানি শুরু হয়েছে কয়েক বছর হতে। এ আম রপ্তানির পরিমাণ যেন প্রতি বছর বাড়তে থাকে এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিক হতে হবে। মৌসুমের শুরুর দিকে আমের গুটি জাতগুলো ১০-২০ কেজি টাকা দরে স্থানীয় বাজার গুলোতে বিক্রি হতে দেখা গেছে। সারাবছর বাগান ব্যবস্থাপনা করে স্বল্প মূল্যে আম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন আম চাষীরা। যদিও ঢাকা, চট্রগ্রামসহ অন্যান্য দূরবর্তী বাজারে এমনটি হতে দেখা যায়নি। কারণ হিসেবে দেখা যায়, আমের সংগ্রহ থেকে শুরু করে পরিবহনের পর অনেক আম নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অবশিষ্ট আম উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে থাকেন আম ব্যবসায়ীরা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমচাষীরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু আম ব্যবসায়ীরা ভালো মুনাফা করছেন। আম সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকা এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে না পারার জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতে আম উৎপাদন হওয়ার কারণে চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। আগাম গুটি জাতগুলো প্রায় সব জেলাতেই চাষ হচ্ছে ফলে দাম বাড়ার সম্ভবনা কম। এজন্য আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ আরো বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে ব্যাগিং প্রযুক্তির

ব্যবহার বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে এবং সারা দেশে তা ব্যবহার হচ্ছে। ফলে রোগ ও পোকার আক্রমণমুক্ত নিরাপদ আম দেশের মানুষ নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারবেন। উৎপাদন বেশি হলে রপ্তানিও করা যাবে অনায়াসে। এ দেশের সুস্বাদু আম রপ্তানির পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে এবং গত সৌসুমে ১৭৩৮ টন আম ২৯টি দেশে রপ্তানি হয়েছে। শুধু কি তাই, প্রাণ কোম্পানি ম্যাগো ড্রিংক্স বা জুস তৈরী করার জন্য আগের মতো ৪০০ কিংবা ৮০০ টাকা দরে আম কিনতে পারছেনা। তারাও এখন আম কিনছেন ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা মণ দরে বা মৌসুমের শেষে ২৪০০ টাকা দরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর আমের উৎপাদন ও চাহিদা দুটোই বাড়ছে। আম ও আমজাত পণ্যের রপ্তানি যদি বাড়ানো যায় তাহলে আমও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চিত্রঃ আম রপ্তানি কার্যক্রম

আমবাগানে মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান কিছু সমস্যা ও এর সমাধান

আমের গুটি ঝরা সমস্যা ও করণীয়

আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ করতে গিয়ে আম উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে আম চাষিরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আমের গুটি ঝরা। তবে সঠিক বাগান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যাটি মোকাবেলা করা যায়। মোটামুটি দুইটি বিষয়ে আগাম ধারণা থাকলে আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। প্রথমটি হলো কখন আর দ্বিতীয়টি হলো কি কারণে আমের গুটি ঝরে। জাতগত বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক কারণ, মাটিতে আর্দ্রতার ঘাটতি, অতিবৃষ্টি, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, কচি পাতার আধিক্য (source sink relation), গর্ভমুন্ডের নিম্ন পরাগগ্রহীতা, বর্ধিষ্ণু ভ্রূনের পুষ্টিহীনতা, সুষম পুষ্টির অভাব, অসময়ে সার প্রয়োগ, দমকা বাতাস, শিলাবৃষ্টি, গাছের নিম্নতেজ ইত্যাদির ফলে আমের গুটি ঝরতে পারে। আমের গুটি ঝরা শুরু হয়ে গেলে তা বন্ধ করা কঠিন। তবে সময়মত ব্যবস্থা নিলে আমের গুটি ঝরা কমানো সম্ভব। নিম্নে আমের গুটি ঝরার বিভিন্ন কারণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রাকৃতিক কারণ

সাধারণত আম গাছে প্রতি পুষ্পমঞ্জুরীতে বা প্রতি থোকায় জাতভেদে ১-৩০টি আমের গুটি ধারণ করতে দেখা যায়। গুটি ধারণের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যেই প্রতি থোকায় ১-২টি গুটি থেকে অবশিষ্ট গুটিগুলো প্রাকৃতিক বা অভ্যন্তরীণ কারণে ঝরে পড়ে। এটি গাছ তার ফল ধারণের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করার জন্যই করে থাকে।

প্রতিকার

এটি প্রতিরোধ করার উপায় চাষীর হাতে নেই। আমের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিকভাবে গুটি ঝরা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয়ে যাবে এবং আমের গুণগত মান ও ফলন কমে যাবে। গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, প্রতি মুকুলে ১টি করে গুটি থাকলেই সে বছরে আমের বাম্পার ফলন হয়ে থাকে। তবে কোন কোন জাতের ক্ষেত্রে প্রতি মুকুলে বা পুষ্পমঞ্জুরীতে একের অধিক আম ধারণ করতে দেখা যায়।

খরা জনিত বা মাটিতে রসের অভাব জনিত কারণ

খরা জনিত বা মাটিতে রসের অভাব জনিত কারণেও আমের গুটি ঝরে পড়তে পারে। আমের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায়

মাটিতে রসের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে রসের অভাব হলে আমের বোঁটায় দ্রুত নির্মোচন স্তর (abscission layer) তৈরি হয়। যার ফলে আমের গুটি অস্বাভাবিক হারে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার

মাটিতে রসের অভাবজনিত কারণে আমের গুটি ঝরে পড়লে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো নিয়মিত সেচ প্রদান করা। আম গাছে ফুল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হওয়ার পর দু'একটি গুটি ধারণের সাথে সাথে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে। প্রথম সেচ দেয়ার পর থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর ৪টি পানির সেচ দিতে হবে। তবে আমগাছের গোড়ায় সেচকৃত অংশে মালচিং বা জাবড়া হিসেবে সহজলভ্য কচুরীপানা ব্যবহার করলে মাসে একবার সেচ দিলেই যথেষ্ট। তবে সেচ প্রদান সুবিধা না থাকলে শুধু পানি স্প্রে করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে আমের গুটি মটরদানাকৃতি হলে প্রতি সপ্তাহে একদিন সকালে পানি স্প্রে করতে হবে। এই সময়ে এক/দুইবার ভালো বৃষ্টিপাত হলে পানি স্প্রের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো হঠাৎ করে প্রখর রৌদ্রে আমবাগানে সেচ না দেয়াই উত্তম।

সেচের পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্য বা হরমোন প্রয়োগ করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। যেমন- আমের গুটি মটর দানা আকৃতি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার অথবা ন্যাফথাইল এসিটিক এসিড ১২ পিপিএম হারে (NAA @12 ppm) মিশিয়ে হালকা সূর্যের আলোতে আমের গুটিতে স্প্রে করলে আমের গুটি ঝরা কমে যায়। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে কোনক্রমেই যেন প্রখর সূর্যালোকে হরমোন স্প্রে করা না হয়।

বরেন্দ্র ও চরাঞ্চলে আমবাগান স্থাপনে সমস্যা ও করণীয়

বর্তমান সময়ে ফলচাষ লাভজনক হওয়ায় সারাদেশে বিভিন্ন ফলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে ফলবাগান হতে আশানুরূপ মুনাফা পাওয়া যায়। ফলে প্রতি বছর আম, লিচু, কুল, কলা, পেঁপে, বারি মাল্টা-১ ও পেয়ারার চাষ ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ফলগুলোর মধ্যে আম বাগান বাড়ছে দ্রুত হারে। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে দ্রুত গতিতে করে বাড়ছে ফলের বাগান। ধান চাষে সেচের পানি সমস্যা ও উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় জমির মালিকেরা ঝুকছে আম চাষের দিকে। শুধু তাই নয় বরেন্দ্র অঞ্চলসহ চর এলাকা এবং অন্যান্য এলাকার পতিত জমি আসছে ফল চাষের আওতায়। বরেন্দ্র ও চর অঞ্চলের মাটির গঠন অন্য এলাকার মাটি হতে একটু ভিন্ন ধরনের। বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটি লাল বর্ণের ও অনুর্বর প্রকৃতির এবং অল্প বৃষ্টি হলেই মাটি একেবারে নরম হয়ে যায়। ফলে এসব মাটিতে গড়ে ওঠা নতুন বাগানে গাছ উল্টানোসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বাগান করার সময় যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে এই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে ফল বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে অতি সহজেই ভাল ও লাভজনক বাগান স্থাপন করা যায়। আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুর জেলায় রয়েছে বরেন্দ্র ভূমি। তার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে বেশ জোরেশরেই। এ এলাকার মাটি যেমন একটু বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত হয় তেমনি কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ফলে খরা মৌসুমে চাষীরা পড়েন বিভিন্ন সমস্যায়। কখনও পানির অভাবে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়, আগা হতে মরা শুরু করে এবং সম্পূর্ণ গাছ এক সময় মারা যায়। চারা বা কলম রোপণের পূর্বে ১ মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতার গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির ১০-১৫ দিন পর প্রস্তুতকৃত গর্তে ২০-৩০ কেজি গোবর সার/ জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টি এস টি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি ওলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে (৮-১০ সেমি গভীরে) সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারিদিকের মাটি দিয়ে সমান্য চেপে দিতে হবে। তবে ইন-সিটু গ্রাফটিং অর্থাৎ প্রথমে গর্তে আঁটি লাগিয়ে পরের বছর ঐ আঁটির গাছে কাঙ্খিত জাতের কলম করা যায়। এক্ষেত্রে প্রধান মূলটি মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে এবং খরার সময় মাটির গভীর হইতে পানি সংগ্রহ করে ও গাছকে তুলনামূলক বেশি দৃঢ়তা প্রদান করে। অপরদিকে কলমের গাছের প্রধান মূলটি কেটে ফেলা হয় ফলে এর গাছগুলো

তুলনামূলক দুর্বল হয় এবং সমান্য ঝড়-বৃষ্টিতে উল্টে যায়। ইন-সিটু (In-situ) পদ্ধতিতে বাগান করতে পারলে গাছ তুলনামূলকভাবে খরা প্রতিরোধী হয়ে থাকে। চর অঞ্চলের মাটি সাধারণ মাটির চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চরের মাটি পলিমাটি ও বেলেমাটি এ দুই স্তর সমন্বয়ে গঠিত। ফলে গাছ যখন পলি মাটিতে লাগানো হয় তখন প্রথম কয়েক বছর ভালোভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্তু যখন বেলে মাটির স্তরে গাছের মূল প্রবেশ করে তখন প্রয়োজনীয় পানি ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। আবার যখন বেলে মাটিতে চারা/কলম লাগানো হয় তখনও প্রয়োজনীয় পানি ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য চারা বা কলম লাগানোর পূর্বে একটু বড় আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো যে সকল জমিতে প্রথম কয়েক বছর ধান বা অন্যান্য ফসল করা হয় বা তুলনামূলক নিচু জমি সেখানে মাদা করে গাছ লাগানো উচিৎ। এটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় ১ মিটার, ১ মিটার ও ১ মিটার মাপের করা ভালো এবং ফসল চাষ করার সময় গাছের গোড়ার আশেপাশে ফাঁকা রাখা উত্তম। অন্যথায় ইঁদুর ব্যপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। তবে গাছের বয়স অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দেশিত মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও এসব জায়গায় বাগানে সবুজ সার জাতীয় ফসলের চাষ করলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিলে বরেন্দ্র ও চরাঞ্চলের মাটিতে লাভজনকভাবে আমবাগান করা সম্ভব।

আমের আগা কালো, সরু বা চিকন হওয়া (Black Tip)

আমের শারীরবৃত্তীয় (physiological disorder) সমস্যাগুলোর মধ্যে আমের আগা কালো হওয়া অন্যতম, যা মূলত ইট ভাটার ধোঁয়ার কারণে হয় বলে ধারণা করা হয়। বর্তমান সময়ে ইট ভাটা বা অটো রাইস মিল সংলগ্ন এলাকায় আমের আগা সরু বা চিকন হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ এই সমস্যাটি সম্পর্কে জানা গেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যাটি নিয়ে আম চাষীদের ক্ষতি হওয়ার খবর প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। আম গবেষকদের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, ইট ভাটা হতে কমপক্ষে দুই কিলোমিটার দুরে নতুনভাবে আমবাগান স্থাপন করার জন্য। এছাড়াও ইট ভাটা মালিকদের চিমনির উচ্চতা ৩৮ মিটার বা ১১৪ ফুট করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আমচাষীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে আমের গুটির বয়স ৪০ দিন হলেই এই সমস্যাটি হতে দেখা যায় এবং আম সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হলে এটি সাধারণ মানুষের নজরে আসে। এ সমস্যাটি শুরু হলে তা দমনের তেমন কোন সুযোগ নেই। তাই

সমস্যাটি শুরু হওয়ার আগেই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। ইটভাটাযুক্ত স্থানে এই সমস্যাটি পুরোপুরি দুর করা সম্ভব নয়। তবে নিম্নের ব্যবস্থাপনাসমূহ গ্রহণ করলে সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

চিত্র: আমে ব্লাক টিপ এর লক্ষণ

করণীয় সমূহ

- আমের অগ্রভাগে কালো দাগ বা চিকন হওয়ার সম্ভবনা থাকলে গুটি ধারণ করার দিন পর হতে প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে বোরিক এসিড মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর ২-৩ বার পর স্প্রে করতে হবে।
- আমের গুটির বয়স ৪০ দিন হলে প্রত্যেকটি আম বিশেষ ধরনের কাগজের ব্যাগ দ্বারা আবৃত করতে হবে বা ব্যাগিং করতে হবে।
- ইট ভাটা আমের বর্ধনশীল পর্যায়ে বন্ধ রাখলে এই সমস্যাটি হতে আমকে রক্ষা করা যাবে। আমবাগান সমৃদ্ধ এলাকায় যেন নতুনভাবে ইট ভাটা না হয় সেজন্য সকলকে সচেতন হতে হবে।

একান্তরক্রমিক ফলধারণ (Alternate bearing habit)

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ বাণিজ্যিকভাবে আম চাষে একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে চাষযোগ্য অধিকাংশ বাণিজ্যিক জাতগুলো ফলধারণে একান্তরক্রমিক স্বভাব প্রদর্শন করে। যেমন খিরসাপাত, ল্যাংড়া, আশ্বিনা, ফজলি ইত্যাদি। তবে কোন গাছে এক বছর প্রচুর আম ধরলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য বছর কম আম ধারণ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলো প্রতি বছর ভালো ফলন দেয় অর্থাৎ একান্তরক্রমিক ফল ধারণ এই জাতগুলোতে দেখা যায় না। একান্তরক্রমিক ফল ধারণের কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কৌলিতাত্ত্বিক কারণ

বা জাতগত বৈশিষ্ট, বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণ, বিটপের আকার ও বয়স, কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত, হরমোনগত অসাম্যঞ্জতা, সুষ্ঠু কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার অভাব, অতিরিক্ত ফল ধারণ ইত্যাদি। একান্তরক্রমিক ফল ধারণ রোধকল্পে কিছু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- নিয়মিত ফল ধারণ করে এমন জাতের গাছ নির্বাচন করতে হবে, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যাসমূহ সময়মত যথাযথভাবে করতে হবে, অফ ইয়ারে সমস্ত গাছ হতে ৫০ ভাগ পুষ্পমঞ্জুরী ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং অফ ইয়ারে সঠিক সময় ও সঠিক মাত্রায় (৪.৫ মি. লি. কার্যকরী উপাদান ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে) কালটার (cultar) এক বছর পর পর প্রয়োগ করা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক আম উৎপাদনকারী দেশে আমের ফলনকে নিয়মিত করতে কালটার ব্যবহার করছে। কালটার গাছের বৃদ্ধি নিরোধক একটি রাসায়নিক দ্রব্য। কালটার আম গাছে প্রয়োগ করা হলে এটি গাছের দৈহিক বৃদ্ধিকে দমিয়ে রেখে ফুল ও ফল আনয়নে সহায়তা করে। কালটার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা আছে। তবে বর্তমানে এদেশে কালটার বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কালটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাছের বয়স অনুযায়ী মাত্রা, সেচ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবারহের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় গাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। অনেক সময় শোনা যায়, কালটার প্রয়োগকৃত বাগানে সাধারণ ব্যবস্থাপনায় আম আসেনা এবং আম গাছের চেহেরাও রোগাক্রান্ত মনে হয়। সেক্ষেত্রে কালটার প্রয়োগকৃত আমগাছগুলোকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করলে পুনরায় ফলবান হবে। আমচাষী ভাইদের প্রতি পরামর্শ, গাছের বয়স অনুযায়ী মাত্রা, ব্যবহার বিধি, ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা না জানলে কালটার ব্যবহার করবেন না। অন্যথায় আপনার আমবাগানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকবে।

নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি

গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এটি একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ফল বাগানে বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাসকরণের জন্য আম বিজ্ঞানিগণ ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন, যা সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। প্রকৃতপক্ষে মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন করতে গিয়ে চাষীদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রোগ, পোকামাকড় ও প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই সকল সমস্যাকে সমাধান করা যায়। ফ্রুট ব্যাগিং বলতে ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিশেষ ধরনের ব্যাগ দ্বারা ফলকে আবৃত করাকে বুঝায় এবং এর পর থেকে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত গাছেই লাগানো থাকবে ব্যাগটি। এই ব্যাগ বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন রং এবং আকারের হয়ে থাকে। তবে আমের জন্য দুই ধরনের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঙিন আমের জন্য সাদা রঙের ব্যাগ এবং অন্য সকল আমের জন্য দুই স্তরের বাদামী ব্যাগ। বর্তমানে আমচাষীগণ দুই স্তরের বাদামি ব্যাগ বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করছেন। তবে দেশে জন্মানো আগাম ও মধ্যম জাতের আমে এক স্তরের সাদা ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত ফলসমূহ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানি উপযোগী।

ব্যাগিং করার উপযুক্ত সময়

আমের প্রাকৃতিকভাবে ঝরা বন্ধ হলেই ব্যাগিং শুরু করতে হবে। বারি আম-১, গোপালভোগ, খিরসাপাত, ল্যাংড়া, বারি আম-২, বারি আম-৬ এবং বারি আম-৭ জাতের ক্ষেত্রে ব্যাগিং করা হয় ৪০-৪৫ দিন বয়সে। এই সময়ে আম জাতভেদে মার্বেল আকারের বা এর চেয়ে বড় আকারের হয়ে থাকে। তবে বারি আম-৩, ৪, ৮, ফজলি, হাড়িভাঙ্গা, আশ্বিনা এবং গৌড়মতি আমের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৬০-৬৫ দিন হলেও ব্যাগিং করা যাবে। ব্যাগিং শুরু করার পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক (সেভিন @ ২ গ্রাম) ও ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন@ ১ গ্রাম) এক লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে। ব্যাগিং করার কমপক্ষে ২-৩ ঘন্টা পূর্বে স্প্রে করতে হবে । যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে পরের দিনও ব্যাগিং করা যাবে। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা ঠিক নয়। আমের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি স্প্রে

দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন প্রথমবার আম গাছে মুকুল আসার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে, দ্বিতীয়বার মুকুল আসার পর অর্থাৎ আমের মুকুল যখন ১০-১৫ সেমি লম্বা হবে কিন্তু ফুল ফুটবেনা এবং আম যখন মটর দানারমতো হবে তখন একবার। আমে স্প্রে পরপরই ব্যাগিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাগিং করার পূর্বেই মরা মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরীর অংশবিশেষ, পত্র, উপপত্র অথবা এমন কিছু যা ফলের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে শুধুমাত্র আম থাকবে।

যে সকল এলাকায় আম বাণিজ্যিবভাবে চাষাবাদ হয় না বা শুধুমাত্র পারিবারিক চাহিদা পূরণে আম গাছ লাগানো হয়েছে এবং এ সমস্ত গাছে সময়মত স্প্রে করা হয় না বা সেই ধরণের প্রচলন এখনও ঐ এলাকায় চালু হয়নি ফলে প্রতি বছরই তাদের গাছে আম ধরে কিন্তু পোকা ও রোগের কারণে অধিকাংশ আম নষ্ট হয়ে যায়। এসব আমগাছে এ প্রযুক্তিটি সবচেয়ে কার্যকরী। এছাড়াও যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং আম দেরীতে পাকে সে সকল আমের জাতগুলো বিবর্ণ বা কালো রং ধারণ করতে দেখা যায় এবং মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় নাবী জাত আশ্বিনাতে ১০০ ভাগ আম মাছি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। যে সমস্ত বাগানে ঘন করে আম গাছ লাগানো হয়েছে এবং বর্তমানে গাছের ভিতরে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না সে সকল গাছে আমের মাছি পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মাছি পোকা দমনের জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রচলিত আছে কোনটিতেই এ মাছি পোকাকে শতভাগ দমন করা সম্ভব নয় বরং আক্রমণের হার কিছুটা কমিয়ে রাখা যায়। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে শতভাগ রোগ ও পোকামাকড় দমন করা যায়। আম রপ্তানির জন্য ভাল মানসম্পন্ন, রঙিন এবং রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত আম প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন আম রপ্তানিকারী দেশে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে কম পরিমাণে বালাইনাশক ব্যবহার করে ১০০% রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত আম উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়াও ব্যাগিং করা আম সংগ্রহের পর ১০-১৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। সেই সাথে রঙিন ও ভালো মানসম্পন্ন নিরাপদ আমও পাওয়া যায়। ব্যাগিং প্রযুক্তি হতে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে;

- ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই অন্যান্য পরিচর্যাসমূহ করতে হবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে ব্যাগিং করতে হবে।
- সংযুক্ত লকটি ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে।
- উপযুক্ত পরিপক্কতায় আম সংগ্রহ করতে হবে।

আমের বাণিজ্যিক ও জনপ্রিয় জাতসমূহের পরিপক্কতা ও সংগ্রহ

বাংলাদেশে প্রায় ৮৫০ ধরনের আম জন্মাতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি জাতের রয়েছে বৈশিষ্টপূর্ণ আকার, রঙ, স্বাদ ও ঘ্রাণ। তবে বাণিজ্যিকভাবে খুব কম সংখ্যক জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন: গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, বারি আম-১ (মহানন্দা/ স্যাঠিয়ারকরা), খিরসাপাত/হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই, বারি আম-২ (লক্ষণভোগ), বারি আম-৩, বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৬, বারি আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯ (কাঁচামিঠা), বারি আম-১০, বারি আম-১১ (বারোমাসি), বারি আম-১২, ফজলি, সুরমাই ফজলি, নাকফজলি, ঝিনুক আশ্বিনা, আশ্বিনা, কাটিমুন (বারোমাসি), ব্যানানা, মল্লিকা, কোহিতুর, সূর্যপুরী ইত্যাদি। এদেশে জন্মানো জাতগুলো আগাম, মধ্যম ও নাবী প্রকৃতির। তবে সম্প্রতি বারোমাসি আমের চাষ এদেশে শুরু হয়েছে। আমের স্বাদ মূলত: নির্ভর করে আমের পরিপক্কতা ও সংগ্রহের উপর। ফলে প্রত্যেক জাতের আসল স্বাদ পেতে হলে উপযুক্ত সময়ে সংগ্রহ করা জরুফর। এ দেশীয় আমের জাতগুলো পরিপক্ক হলে রঙের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। তবে যে কোন জাতের ব্যাগিংকৃত আম হলুদ রঙের হয়ে থাকে। সুতরাং শুধুমাত্র রঙ দেখে পরিপক্কতা নির্ধারণ করা সঠিক নয়। নিম্নে বিভিন্ন জাতের পরিপক্কতা ও সংগ্রহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো।

গোপালভোগ

এটি একটি আগাম আম। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ জাতটি মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পরিপক্ক হতে শুরু করে এবং জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ক আম দেখতে হালকা সবুজ বর্ণের, তবে ব্যাগিংকৃত আম সম্পূর্ণ হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। পাকা আমের সুমিষ্ঠ ঘ্রাণ আছে। এ জাতটি হালকা নরম হলেই খাওয়া যাবে।

গোবিন্দভোগ

এটি একটি আগাম জাত। শুধুমাত্র সাতক্ষীরা জেলায় এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। অন্য জেলায় এ জাতের সম্প্রসারণ তেমনটি চোখে পড়ে না। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ জাতটি পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক আম দেখতে হালকা সবুজ বর্ণের, তবে ব্যাগিংকৃত আম হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। এ জাতের আম হালকা নরম হলেই খাওয়া যাবে।

বারি আম-১ (মহানন্দা/স্যাঠিয়ারকরা)

এটি একটি আগাম জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ হয়। এ জাতটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ব হয় এবং জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে থাকে। গাছে থাকা অবস্থায় জাতটি হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ব আম হালকা সবুজ থেকে হলুদ বর্ণের। গাছে ৫-১০ ভাগ আম হলুদ বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হয়। তবে কোন ভাবেই গাছে আম হলুদ না হলে সংগ্রহ করা উচিৎ নয়। কারণ আগাম সংগ্রহকৃত ও অপরিপক্ব আম বেশ টক ও মিষ্টতা কম থাকে।

খিরসাপাত

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ জাতটি সবচেয়ে বেশি জন্মায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলা ব্যতিত অন্য জেলায় জাতটি হিমসাগর নামে পরিচিত। সাতক্ষীরা জেলায় এ জাতটি মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পরিপক্ব হয়। তবে রাজশাহী জেলায় জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ শুরু হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার খিরসাপাত জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে বাজারে পাওয়া যায়। এ জাতটি জিআই পণ্য হিসেবে ইতোমধ্যেই নিবন্ধিত হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রপ্তানির সুযোগ আছে।

ল্যাংড়া

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এটি সবচেয়ে বেশি জন্মায়। সাতক্ষীরা জেলায় এ জাতটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ব হয়। তবে রাজশাহী জেলায় জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ শুরু হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি জুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আমের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের। এ জাতটি জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং এ জাতটি রপ্তানির সুযোগ আছে।

বোম্বাই

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ জাতটি সবচেয়ে বেশি জন্মায়। রাজশাহী জেলায় জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ শুরু হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি জুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আমের রঙ

হালকা সবুজ বর্ণের। খেতে বেশ সুস্বাদু কিন্তু পরিচিতি কম হওয়ার কারণে গুটি আম হিসেবে কম দামে বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়।

বারি আম-২ (লক্ষণভোগ)

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ জাতটি সবচেয়ে বেশি জন্মায়। রাজশাহী জেলায় জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ শুরু হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আমের রঙ হালকা সবুজ থেকে হলুদ বর্ণের। তবে ভালোভাবে পরিপক্ব আম হালকা হলুদ হতে দেখা যায়। স্বাদে কম মিষ্টি হওয়ায় স্থানীয় বাজারে এ জাতটির চাহিদা তুলনামূলক কম। ডায়াবেটিক রুগীরা কম মিষ্টির জন্য জাতটি পছন্দ করে থাকেন। এই জাতটির সংরক্ষণকাল সবচেয়ে বেশি এবং রপ্তানি সুযোগ রয়েছে।

বারি আম-৩

এটি একটি নাবী জাত। পার্বত্য জেলাসমূহ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলায় এ জাতটির সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। তবে সকল জেলাতেই জাতটি জন্মাতে দেখা যায়। পাবর্ত্য জেলাসমূহে ও সাতক্ষীরা জেলায় জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপক্ব হয়। তবে রাজশাহী জেলায় জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ শুরু হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আমের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের। দেশি ও বিদেশি বাজারে এ জাতটির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। গত কয়েক বছর ধরে এ জাতটি রপ্তানি হচ্ছে।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

এটি একটি নাবী জাত। সারাদেশে জাতটির চাষাবাদ শুরু হয়েছে। পাবর্ত্য জেলাসমূহে, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিপক্বতা আসে। রাজশাহী জেলায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগ্রহ শুরু হয়। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সংগ্রহ শুরু হয়। এ জাতটি প্রায় ২ মাস বাজারে দেখা যায়। পরিপক্ব আম হালকা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। তবে পর্যাপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গায় হালকা খয়েরী রং ধারণ করতে দেখা যায়। এ জাতটির সংরক্ষণকাল বেশি ও রপ্তানিযোগ্য।

বারি আম-৬

এটি একটি মধ্যম মৌসুমী জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জাতটি জন্মাতে দেখা যায়। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে সংগ্রহ শুরু হয় এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আমের রং হালকা সবুজ। স্থানীয় বাজারে জাতটির চাহিদা আছে।

বারি আম-৭

এটি একটি মধ্যম মৌসুমী জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বেশি দেখা যায়। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিপক্বতা আসে এবং শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব আম হলুদাভ সবুজ এবং বোঁটার চারপাশে আপেলের মতো রঙ দেখা যায়। এ জাতটির সংরক্ষণ ক্ষমতা ৭-৯ দিন এবং রপ্তানি উপযোগী।

বারি আম-৯ (কাঁচামিঠা)

এ জাতটি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়। মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ খাওয়ার জন্য বেশ উপযোগী। জাতটি দেখে পরিপক্বতা অনুমান করা কঠিন। সুতরাং সময়টি মনে রাখলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

বারি আম-১০

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। পার্বত্য জেলাসমূহে এবং সিলেট জেলায় জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয় বিধায় বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এ জাতটি পরিপক্ব হয়।

বারি আম-১১ (বারোমাসী)

এটি একটি বারোমাসী জাত। বছরে তিনবার (জানুয়ারী, মে ও সেপ্টেম্বর) মাসে পরিপক্ব হয়। পরিপক্ব ফলের রঙ হলুদ বর্ণের। আমের রঙ হালকা হলুদ বা সবুজাভ হলুদ হলেই সংগ্রহ উপযোগী হয়। এ জাতটি রপ্তানি উপযোগী।

বারি আম-১২

এটি একটি নাবী জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হয়েছে। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতটি পরিপক্ব হয়। নাবী হওয়ায় জাতটির বাজার মূল্যও বেশি।

ফজলি

এটি একটি নাবী জাতের আম। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ হয়ে থাকে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিপক্ব হয় এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরিপক্ব ফল দেখতে হালকা সবুজ রঙের। সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি ও রপ্তানিযোগ্য।

সুরমাই ফজলি

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। জুন মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে সংগ্রহ করা হয়। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের।

নাকফজলি

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। শুধুমাত্র নওগাঁ জেলায় এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিপক্ব হতে দেখা যায়।

ঝিনুক আশ্বিনা

এটি একটি নাবী জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। আকারে আশ্বিনার চেয়ে একটু ছোট এবং সুমিষ্ট। এ জাতটি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের।

আশ্বিনা

এটি একটি নাবী জাত। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। আকারে বড় এবং সুমিষ্ট। এ জাতটি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের। তবে ব্যাগিংকৃত আম গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সব থেকে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এ জাতটি জিআই নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই জিআই নিবন্ধন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাঁড়িভাঙ্গা

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাতের আম। রংপুর বিভাগে এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপক্ব হয়ে থাকে। তবে বাজারে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাওয়া যায়। পরিপক্ব ফলের রং হালকা সবুজ।

সূর্যপুরী

এটি একটি মধ্যম মৌসুমি জাত। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় এ জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়ে থাকে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ জাতটি পরিপক্ব হয়। পরিপক্ব ফলের রং হালকা সবুজ বর্ণের। দেশের অন্যান্য জেলায় এ জাতটির চাষাবাদ তেমন চোখে পড়ে না।

কোহিতুর

এটি একটি নাবী জাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়ে থাকে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এ জাতটি সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ রঙের।

মল্লিকা

এটি একটি নাবী জাত। সারাদেশেই এ জাতটি জন্মাতে দেখা যায়। এ জাতটি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ব হয়ে থাকে। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ হতে সবুজাভ হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। কোন ভাবেই গাছে আম হলুদ না হলে সংগ্রহ করা উচিৎ নয়। কারণ আগাম সংগ্রহকৃত ও অপরিপক্ব আম বেশ টক ও মিষ্টতা কম থাকে।

পরিশেষে ক্রেতা সাধারণের জন্য পরামর্শ হচ্ছে, পছন্দের জাতটি কখন পরিপক্ব হয় সেটি মনে রাখা এবং সেই সময়ে সংগ্রহ করে ভক্ষণ করলে আমের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

আমবাগান হতে ভালো ফলন পেতে আমগাছের পরিচর্যার মাস-পঞ্জী

বিগত বছরগুলোতে দেশের উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতে আমের চাষাবাদ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশের ২৩টি জেলায় আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতি বছর নতুন নতুন জেলায় আমের চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমবাগান হতে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আমবাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুফর। আমবাগান হতে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে বছরব্যাপী আমবাগানের পরিচর্যা প্রয়োজন। এ সকল পরিচর্যাসমূহ মাসভিত্তিক আলোচনা করা হলো।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয়
১	জানুয়ারি	হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে।
		স্যুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে	সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন থিয়োভিট, কুমুলাস ইত্যাদি নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
		এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে	মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		মাটিতে রসের ঘাটতি থাকতে পারে	সেচ প্রদান করা যাবে না
২	ফেব্রুয়ারি	হপার পোকার আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন/ (থায়োমেথোক্সাম+ ফিপরোনিল) গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে।
		সুটি মোল্ড রোগ/ পাউডারি মিলডিউ	সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয়
		রোগ দেখা দিতে পারে	
		ইনফ্লোরোসেন্স মিজ এর আক্রমণ হতে পারে	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন/ (থায়োমেথোক্সাম+ ফিপরোনিল) নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		মাটিতে রসের ঘাটতি থাকতে পারে	ফুল ফোটা শেষ হলে সেচ প্রদান শুরু করা যেতে পারে।
		মাকড়	মাকড়নাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
৩	মার্চ	আমের গুটি ঝরা সমস্যা দেখা দিতে পারে।	আমের গুটি মটরদানাকৃতি হলে বোরিক এসিড ৬ গ্রাম/লিটার অথবা ইউরিয়া ২০ গ্রাম/ লিটার হারে স্প্রে করলে গুটি ঝরা কমবে।
		দাদ রোগ দেখা দিতে পারে।	ইপ্রোডিয়ন/ কাবেন্ডাজিম/ (ইপ্রোডিয়ন+কাবেন্ডাজিম) গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		স্যুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে	সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
		মাটিতে রসের ঘাটতি হতে পারে	ফুল ফোটা শেষ হলে সেচ প্রদান করা যেতে পারে।
		এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে	(টেবুকোণাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন)/ (এজোক্সিস্ট্রবিন+ ডাইফেনোকোনাজল)/ মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয়
৪	এপ্রিল	ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে।	ফেনিট্রোথিয়ন/ক্লোরপাইরিফস/কার্বারিল/(থায়োমেথোক্সাম+ফিপরোনিল) গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
		দাদ দেখা দিতে পারে	ইপ্রোডিয়ন/কাবেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		এ্যানথ্রাকনোজ দেখা দিতে পারে	(টেবুকোণাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন)/(এজোক্সিস্ট্রবিন+ডাইফেনোকোনাজল)/ মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		বাগান ব্যবস্থাপনা	সার প্রয়োগ করতে হবে।
৫	মে	আমের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে	ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবচেয়ে সফলভাবে এ পোকাটি দমন করা যায়। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যায়। বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬	জুন	আমের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে	ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কোন বালাইনাশকের ব্যবহার প্রয়োজন হবে না
			তবে ব্যাগিং না করলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ও কাবেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
৭	জুলাই	আমের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে	ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করলে পরবর্তীতে কোন বালাইনাশকের ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে না
			তবে ব্যাগিং না করলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ও কার্বেন্ডাজিম

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয়
			গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
৮	আগস্ট	এ্যাপসিলা পোকার আক্রমণ	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। পাতার নিচের দিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
		বাগান ব্যবস্থাপনা	মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে এবং কাটা অংশে বোর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে
			গাছের বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাত্রায় সার ব্যবস্থপনা করতে হবে
			ধ্যারা/পরগাছা থাকলে কেটে অপসারণ করতে হবে। কান্ড হতে গজানো নতুন কুশি ও পুরাতন অপ্রয়োজনীয় শাখা কাটতে হবে।
৯	সেপ্টেম্বর	বাগান ব্যবস্থাপনা	পূর্বে সার প্রয়োগ না করলে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
			আম বাগানের আগাছ দমন করতে হবে।
১০	অক্টোবর	পাতা কাটা উইভিল পোকার আক্রমণ	নতুন পাতা বের হলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় একবার ব্যবহার করতে হবে।
		আগাছা	বাগান চাষ দিয়ে পরিষ্কার পরিছন্ন করতে হবে।
			আম বাগানের আগাছা দমন করতে হবে।
১১	নভেম্বর	আগাছা	আম বাগানের আগাছা দমন করতে হবে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ	করণীয়
		হপার পোকা দেখা দিলে	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডা সাইহ্যালাথ্রিন /সাইপারমেথ্রিন নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে	মাঝে মাঝে আম বাগান পরিদর্শন করতে হবে।
১২	ডিসেম্বর	হপার পোকা দেখা দিতে পারে।	ইমিডাক্লোপ্রিড/ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন /সাইপারমেথ্রিন নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে।
		স্যুটি মোল্ড দেখা দিতে পারে	সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন থিয়োভিট, কুমুলাস ইত্যাদি নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
		এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিলে	(টেবুকোণাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন)/ (এজোক্সিস্ট্রবিন+ ডাইফেনোকোনাজল)/ মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
		আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন হলে	সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন থিয়োভিট, কুমুলাস ইত্যাদি নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

এছাড়াও পরিবর্তিত আবহাওয়ায় অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তা ও ফল বিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এই মাস-পঞ্জীটি আমচাষীদের ভালোমানের আম উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার

আমের চাষাবাদ অনেকাংশেই বিজ্ঞানভিত্তিক। এ পুস্তকটিতে সহজভাবে বর্ণিত আমের চারা বা কলম নির্বাচন হতে শুরু করে রোপণ, প্রুনিং, ট্রেনিং, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ-বালাই দমন, আম সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং আমগাছের মাসব্যাপী কার্যক্রম সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। এ সকল নিয়মকানুন অনুসরণ পূর্বক আম চাষ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে

দেশে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আম বিজ্ঞানিদের আশাবাদ, দেশীয় জনপ্রিয় এই ফলটির উৎপাদন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাবে এবং ভোক্তাগণ বেশি পরিমাণে এই ফলটি গ্রহণ করবেন যা জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিদেশী ফলের উপর আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ী হবে। অধিকন্তু আমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও প্রকাশনা

শফিকুল, এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১১. আমের নতুন জাতের পরিচিতি, উৎপাদন প্রযুক্তি ও পরিচর্যা. আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পাতা নং ১-৩২

হোসেন, এম. এ. এবং অন্যান্য. ২০১১. ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল. উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর. পাতা নং ১-১৬৩

উদ্দিন, এম. এস. এবং রেজা, এম.এইচ. ২০১৭. ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন পদ্ধতি, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পাতা নং ১-১৬

উদ্দিন এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১৮. আমের আধুনিক চাষাবাদ ও বিপণন কৌশল, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পাতা নং ১-৪৭

উদ্দিন, এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১৮. আম উৎপাদন নির্দেশিকা (উত্তম কৃষি পদ্ধতির আলোকে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন কলাকৌশল), জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পাতা নং ১-৫৬

উদ্দিন, এম.এস. ২০১৯. আম উৎপাদন নির্দেশিকা (আম উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি কলাকৌশল). জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পাতা নং-১-৯৬

সরকার, বি. সি., ইসলাম, এম. এন., বর্মন, জ. সি., ইসলাম, এম. এম., এবং উদ্দিন, এম. এস. ২০২১. আমের জাত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি. ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১. পাতা নং-১৯০

Esguerra, E. B., Rolle. R and Rahman, M. A. 2017. Postharvest management of mango for quality and safety assurance. FAO Regional Office for Asia and the Pacific. P.51

Uddis, M. S. 2013. Application of Molecular Techniques for the Improvement of Mango Production. A PhD Thesis, Biotechnology Research Institute, Beijing, China. P. 70